2002

# পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ☐ ৯ম সংখ্যা

১৫ নভেম্বর, ২০০২ ইসাব্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আহমদনগর জামাতে ওয়াকফে নও শিশু-কিশোরদের মাঝে উকিল ওয়াকফে নও সৈয়দ কমর সুলেমান সাহেব (দোয়ারত)

রংপুর জামাতে ওয়াকফে নও শিশু-কিশোর ও তাদের অভিভাবকদের মাঝে উকিল ওয়াকফে নও সৈয়দ কমর সুলেমান সাহেব

বগুড়া জামাতে ওয়াকফে নও শিশু-কিশোর ও তাদের অভিভাবকদের মাঝে উকিল ওয়াকফে নও সৈয়দ কমর সুলেমান সাহেব

## ঈদুল ফিতরের প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয়

ধীরে ধীরে মাহে রমযানের রহমত ও বরকতের দিনগুলো পার হয়ে আমরা মাগফেরাতের দিনগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। মাহে রমযানে আমাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্বাবলী আমরা যতটা পালন করেছি এর ওপরে নির্ভর করবে আমাদের মাগফেরাত ও নাজাতের বিষয়টি। আমি সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর জন্যে দোয়া করছি যেন আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এ রমযানে আমাদের সকলের আল্লাহ্‌র মাগফেরাত লাভের সৌভাগ্য হয়। আমাদের নাজাতের পথ যেন সুপ্রশস্ত হয়।

রমযানের শেষ দশকে যাদের ই'তিকাফে বসার সৌভাগ্য লাভ হবে তাদের প্রতি আমার আবেদন- আপনারা এ বিষয়টি অবশ্যই মনে রাখবেন যে, আপনারা জামাতের পক্ষ থেকেও ই'তিকাফে বসেছেন। সুতরাং আপনারা ব্যক্তিগত দোয়ার ওপরে হুযূর (আইঃ)-এর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ কর্মময় জীবনের জন্যে, আমাদের নিরাপত্তা, বিস্তৃতি সর্বোপরি কল্যাণের জন্যে দোয়া করাকে প্রাধান্য দিবেন। আপনারা যদি জামাতের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেন তাহলে আসমানে ফিরিশ্‌তারা আপনাদের জন্যে দোয়া করবেন। বর্তমানে হুযূর (আইঃ)-এর সুস্বাস্থ্যের জন্যে বিশেষ দোয়ার যে কতটা দরকার তা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আশা করি মু'তাকিফ ভ্রাতা ও ভগ্নী নিজ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করতঃ জামাতের জন্যে দোয়াকে প্রাধান্য দিবেন। আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে তৌফীক দান করুন।

পবিত্র ঈদ আমাদের দ্বার প্রান্তে। এ ঈদ আমাদের সকলের জন্যে কল্যাণবহ হোক এ কামনা করছি। আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমাদের জামাতের পক্ষ থেকে আহমদী অ-আহমদী নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী ভাই-বোনকে জানাই শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ। পবিত্র ঈদের প্রেক্ষাপটে আমি আহমদী ভাই-বোনকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর নির্দেশাদি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। হুযূর (আইঃ) ঈদের খুশী গরীব ভাইদের ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার জন্যে তাগিদ করেছেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য আমরা যেন আমাদের আশে-পাশে যেসব গরীব রয়েছেন তাদেরকে সাথে নিয়ে ঈদের আনন্দ ভাগ করে উপভোগ করি। এজন্যে হুযূর (আইঃ) বলেছেন, আমরা যেন কিছু তোহ্‌ফা নিয়ে ঈদের দিনে গরীব ভাইদের বাড়ীতে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যাই।

আমাদের প্রিয় দেশ, বাংলাদেশের জন্যেও আমরা এ পবিত্র কল্যাণের মাসে দোয়া করছি। এদেশ বর্তমানে নানা প্রকার সমস্যায় জর্জরিত। আল্লাহ্‌তাআলা যেন এসব সমস্যা দূরীভূত করে দেন এবং সরকারকে সঠিকভাবে দেশ পরিচালনার সৌভাগ্য দান করেন। দেশের সার্বিক অগ্রগতি ও আইন শৃঙ্খলার উন্নতির জন্যে প্রত্যেক আহমদী ভাই-বোনকে ঐকান্তিকতার সাথে দোয়া করার আহবান জানাচ্ছি।

**আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী**
ন্যাশনাল আমীর

# পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ॥ ৭ম সংখ্যা

১ অগ্রহায়ণ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ৯ রমযান ১৪২৩ হিঃ কাঃ
১৫ নবুওয়ত ১৩৮১ হিঃ শাঃ ১৫ নভেম্বর ২০০২ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100



**সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি**
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

**ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক**
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

**নির্বাহী সম্পাদক**
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

**বার্তা সম্পাদক**
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

**প্রচার সম্পাদক**
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

**শিল্প নির্দেশক**
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

**সহকারী শিল্প নির্দেশক**
সালাহউদ্দীন আহমদ

**বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি**
আব্দুল আউয়াল ইমরান

**হিসাব ব্যবস্থাপক**
মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার

**বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা**
এ. কে. রেজাউল করীম

**বিদেশ প্রতিনিধি**

| | | |
|---|---|---|
| মুহাম্মদ আব্দুল হাদী | – | লন্ডন, ইউ কে |
| ইসমত পাশা | – | কানাডা |
| মোহাম্মদ খলিলুর রহমান | – | নিউ ইয়র্ক |
| মইন উদ্দীন সিরাজী | – | ক্যালিফর্নিয়া |
| আজিজ আহমদ চৌধুরী | – | জার্মানী |
| কাউসার আহমদ | – | হল্যান্ড |
| এন, এ, শামীম আহমদ | – | বেলজিয়াম |
| ইসমত উল্লাহ্ | – | জাপান |
| ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ | – | নিউজিল্যান্ড |
| ফকির আব্দুস সাত্তার | – | সিঙ্গাপুর |

**তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্**



আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@ bol-online.com


*সম্পাদকীয়*

## প্রকৃত ঈদই কাম্য

আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ। সকলের জন্যে ইহা কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসুক।

পবিত্র মাহে রমযানের রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের দিনগুলো একে একে চলে যাচ্ছে আর পবিত্র ঈদুল ফিতরের শওয়ালের এক ফালি ঈদের চাঁদ-বাঁকা চাঁদ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে বলবে, আস ঈদ করো, আনন্দ-ফূর্তি করো। অথচ আনন্দ-ফূর্তি কীসের তা ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এ আনন্দ-ফূর্তি কি নতুন জামা-কাপড় পরার আর সেমাই-খাওয়ার, রমযানের বোঝা আমাদের কাঁধ থেকে নেমে গেছে সে জন্যে? নাকি বড় লোকেরা ভাল ভাল দামী-দামী কাপড়-চোপড় পরে ঈদের খুশীতে ভরপুর হয়েছে আর কতগুলো লোক নগ্ন দেহে, ভগ্ন স্বাস্থ্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরছে আর বলছে মা গো! খাবার দিবেন? ফিত্‌রা দিবেন- এজন্যে? নাকি এজন্যে যে, পবিত্র আরব ভূমি ইহুদী নাসারা কর্তৃক দলিত-মথিত হয়েছে ও হচ্ছে, অথবা প্যালেস্টাইনে মুসলমানগণ ইহুদী কর্তৃক নিগৃহীত হচ্ছে বা মুসলমানগণ আপোষে বিভিন্ন স্থানে লড়ছে আর ভাই ভাই-এর রক্তে খুশীতে আটখান হচ্ছে? খুব গভীরভাবে ভাবতে গেলে এ খুশী কি এ রকম নয় যে, কারও ঘরে মৃত পড়ে রয়েছে আর ঘরের লোকেরা আনন্দ ফূর্তিতে মশগুল?!

'ঈদ' অর্থ যে খুশী বার বার আসে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জাতির জন্যে এটা দু'বার এসেছিল। প্রথমতঃ 'আওয়ালীন'দের জন্যে যারা প্রায় তিন শতাধিক বছর ঈমানের সম্পদকে রক্ষা করার জন্যে মাটির গুহায় কঠোর জীবন-আসহাবে কাহাফের জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁরাও নিঃসন্দেহে একটা ঈদের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। 'আখেরীন'দের মধ্যে অর্থাৎ রোমান সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইনের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত হযরত মসীহ্ নাসেরী (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে (সূরা মায়েদা-১১৫) খৃষ্টানরা ঈদ উপভোগ করতে থেকেছে। দুনিয়াতে প্রভুত্ব বিস্তার করে অর্থনৈতিক মুক্তিলাভ করেছিল। এমনকি সারা দুনিয়ার রিযকের ভান্ডার অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত 'রুটির পাহাড়ে'র মালিক বনে তারা এক প্রকার ঈদের আস্বাদ লাভ করেছিলো।

সপ্তম ও অষ্টম শতকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সময়ে এবং পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও মুসলমানগণ এক প্রকার ঈদ আস্বাদন করেছিলেন। কিন্তু ফাইজে আওয়াজের (বক্র-পথপ্রভ্রষ্টতার) যুগে তারা ঈদ থেকে বঞ্চিত হয়। 'মুহাম্মদী মসীহ্' (আঃ)-এর যুগে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানের মধ্যে পুনরায় 'খেলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়ত'-এর পদ্ধতিতে খেলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুনরায় মুসলমানগণ ঈদের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করবে বলে কুরআন এবং হাদীসের আলোকে জানা যায়। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে আহমদীয়া খেলাফতের মাধ্যমে সে কর্মকান্ড শুরু হয়েছে। বিশ্ব মুসলিম যত শীঘ্র সে খেলাফতকে গ্রহণ করে তাদের অনৈক্য দূর করে ঐ ইলাহী কর্মকান্ডের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করবে তত শীঘ্র তারা সেই প্রতিশ্রুত 'প্রকৃত ঈদ'কে প্রত্যক্ষ করবে এবং দুনিয়াতে তখন পুনরায় প্রকৃত অর্থে সার্বিকভাবে আবার আল্লাহ্‌তাআলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তখন ধর্ম বলতে ইসলামকেই বুঝাবে ও নেতা বলতে বুঝাবে আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে। সেই প্রকৃত ঈদই আমাদের কাম্য।

-নির্বাহী সম্পাদক

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ■ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ - ৭ | ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে | ৩ |
| ■ হাদীস শরীফ ঃ নামায-এর আদব | ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ | ৩-৪ |
| ■ অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী - হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) | ঃ অনুবাদ ঃ মৌঃ মুহাম্মদ আজিম উদ্দীন আহমদ | ৪ |
| ■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'নূর' সম্পর্কে ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) | ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী | ৫-৭ |
| ■ ঈদুল ফিতরের খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) | ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ | ৭-৮ |
| ■ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) | ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী | ৯-১০ |
| ■ ঐশী-বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) | ঃ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন | ১১-১৩ |
| ■ মুনাজাতে রসূল (সঃ) - মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ | ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান | ১৪-১৫ |
| ■ বেশি নিবিড় ও গভীরভাবে উপলব্ধি | ঃ জনাব মোহাম্মাদ মুস্তাফা আলী | ১৫ |
| ■ অমর যাঁর জীবন কথা | ঃ মাওলানা মাহমুদ আহমদ | ১৫ |
| ■ প্রসঙ্গ ঃ রোযা | ঃ জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান | ১৬-১৭ |
| ■ ছোটদের পাতা ঃ ফুলের তোড়া (গুলদাস্তা) (১০-১৩ বছর বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক) | ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান | ১৭-১৮ |
| ■ জামাতের নামায পড়ার গুরুত্ব মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) | ঃ অনুবাদ - মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা | ১৯-২০ |
| ■ কুরআন করীম ... হেদায়াত স্বরূপ মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) | ঃ অনুবাদ - মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের | ২১ |
| ■ কবিতা ঃ আমার প্রিয় কে? সে কেমন? -হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) | ঃ অনুবাদ - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী | ২১ |
| ■ নতুনদের পাতা | | |
| ● বন্ধুগণ রমযানের অঙ্গীকার মনে রাখুন মূল ঃ হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) | ঃ অনুবাদ - জনাব কওসার আলী মোল্লা | ২২-২৩ |
| ● রমযান ও ই'তিকাফ | ঃ মৌঃ মোঃ মজিদুল ইসলাম | ২৪-২৬ |
| ● রোযার মাহাত্ম্য | ঃ মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন | ২৭-২৮ |
| ● রোযা ঃ তাকওয়ার চূড়ায় আরোহণ | ঃ জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব (জয়) | ২৮-৩০ |
| ■ ওসীয়্যত সংক্রান্ত নিয়মাবলী | ঃ জনাব মোহাম্মদ ফজলুর রহমান | ৩১ |
| ■ সংবাদ | ঃ | ৩১-৩২ |


প্রচ্ছদ ঃ ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদ, বাংলাদেশ ❐ নুসরত জাহান মসজিদ, ডেনমার্ক ❐ মসজিদ বাশারত, স্পেন

## হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর দোয়ার রীতি

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

- "নামায দোয়ারই অপর নাম। এজন্যে এর মাঝে দোয়া করো যেন উহা তোমাদেরকে পৃথিবী ও পরকালে বিপদা-আপদ থেকে রক্ষা করে আর সমাপ্তি যেন কল্যাণময় হয়"(মলফূযাত, ৩ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৫)।
- "হুযূর (আঃ) বলেন, আমি কতগুলো দোয়া প্রত্যেক দিন করে থাকি।

**প্রথম ঃ** নিজের আত্মার কল্যাণের জন্যে দোয়া করি, হে মহানুভব খোদা! তুমি আমা দ্বারা ঐ কাজ নাও যদ্বারা তাঁর সম্মান ও প্রতাপ প্রকাশিত হয় এবং তাঁর সন্তুষ্টির পুরো সৌভাগ্য দান করেন।

**দ্বিতীয় ঃ** পরে নিজের ঘরের লোকদের জন্যে দোয়া করি, তাদের দ্বারা যেন চোখ জুড়ায় এবং তারা যেন আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টির পথে চলে।

**তৃতীয় ঃ** আবার নিজের সন্তানদের জন্যে দোয়া করি তারা সবাই যেন ধর্মের সেবক হয়।

## কালামুল ইমাম

**চতুর্থ ঃ** পরে নিজের নিষ্ঠাবান বন্ধুদের জন্যে নাম নিয়ে নিয়ে দোয়া করি।

**পঞ্চম ঃ** আর আমরা তাদেরকে চিনি বা না চিনি সবার জন্যে যারা এ জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট (আল হাকাম, ৪ খন্ড পৃষ্ঠা ২-১১, তারিখ ১৭ জানুয়ারী, ২৯০০, পত্র নং ৪, মাওলানা আব্দুল করীম)।

- "আমি সর্বদাই দোয়ার মধ্যে লেগে থাকি। আর সবচে' প্রাধান্য প্রাপ্ত দোয়া এই যে, আমার বন্ধুদেরকে দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদে রাখেন। কেননা আমাকে তো তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাও দুঃখ-কষ্ট দেয়। আবার এই দোয়া সর্বাঙ্গীন ধরনের করা হয় যে, যদি কারও কোন দুঃখ-কষ্ট পৌঁছে তাহলে আল্লাহ্তাআলা তাথেকে তাদেরকে মুক্তি দেন। সারাটা ঐকান্তিক ও পরিপূর্ণ উৎসাহ এটাই হয়ে থাকে, আল্লাহ্তাআলার নিকট যেন দোয়ায় লেগে থাকি (মলফূযাত, ১ খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৬)।

**দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রতি ইলহাম ঃ**

১। **কুল মা ইয়া'বাও বিকমু রব্বী লাওলা দু'আউকুম** (তিরিয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা ৬০)

অর্থ ঃ তাদেরকে বলে দাও, আমার খোদা তোমাদের কি পরওয়া করেন যদি তোমাদের দোয়া না হয়?

২। **আফামাঁইউজীবুল মুযত্বররা ইযা দাআহু** (তাযকিরা পৃষ্ঠা, ৭২৯)

অর্থ ঃ কে আছে যে, নিঃসহায় লোকের আকুতি-মিনতি পূর্ণ দোয়া শুনেন, যখন সে তাঁকে ডাকে?

৩। **ইন্নাহু সামীউদ্দু'আই** (তাযকিরাহ্ পৃষ্ঠা ৯৬)।

অর্থ ঃ নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) দোয়া শুনে থাকেন।

৪। **উদ'উনী আসতাজিবলাকুম** (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৬০৪, রূহানী খাযায়েন ৫ পৃষ্ঠা)।

অর্থ ঃ তোমরা দোয়া করো আমি কবুল করবো।

উপস্থাপন ও অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

## সূরাতুল আ'রাফ - ৭

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২। সে (মূসা) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও আমার ভাইকে এবং আমাদের উভয়কে তোমার কৃপায় প্রবেশ করাও। কেননা তুমিই সবচেয়ে অধিক কৃপাকারী।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩। নিশ্চয় যারা বাছুরকে[১০৫৭] (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছে, অবশ্যই তাদের ওপর তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্রোধ বর্ষিত হবে এবং ইহজীবনে লাঞ্ছনা। আর এভাবেই যারা মিথ্যা বানিয়ে বলে আমরা তাদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥٤﴾

১৫৪। আর যারা মন্দ কাজ করে ও তারপর তওবা করে এবং ঈমান আনে নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক তারপরও অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫। এবং যখন মূসার রাগ নেমে গেল সে ফলকগুলো তুলে নিল; আর যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে ওগুলোর লেখার মধ্যে তাদের জন্য ছিল হেদায়াত ও কৃপা।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ۗ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۗ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ۗ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬। এবং মূসা আমাদের (সাথে মিলিত হবার) নির্ধারিত স্থান ও সময়ের জন্য নিজ জাতির সত্তর জন লোককে বেছে নিল। অতঃপর যখন ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত হানলো,[১০৫৭-ক] সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি চাইলে পূর্বেই তাদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে। আমাদের মধ্যে নির্বোধরা যে কাজ করেছে তার জন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে? এটা তোমার পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নয়, এর দ্বারা তুমি যাকে চাও পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত কর আর যাকে চাও পথ দেখাও। তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের ওপর কৃপা কর এবং তুমি সব চেয়ে উত্তম ক্ষমাকারী।

১০৫৭। বাছুর পূজা করার মত দুষ্কর্মে হারূন (আঃ)-এর সহযোগিতার দোষারোপজনিত বাইবেলের বিবরণ নিশ্চয় বিভ্রান্তিকর (এনসাইকো বিব-১ম-কল ঃ ২)।

১০৫৭-ক। ভূকম্পন এক প্রাকৃতিক ব্যাপার। হযরত মূসা (আঃ) ভয় করেছিলেন যে, তাঁর জাতির পাপাচারের কারণে এটা ঐশী-শাস্তি ছিল।

## হাদীস শরীফ

### নামায-এর আদব

কুরআন ঃ

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

অর্থ ঃ তোমরা সকল নামাযের বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের সুরক্ষা কর (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ২৩৯ আয়াতাংশ)

হাদীস ঃ

"আন আবি হুরায়রাতা আন্না রসূলুল্লাহে ক্বালা লা ইয়াযালু আহাদুকুম ফী সালাতিন মা দামাতিস্ সালাতু তাহবেসুহু লা ইয়ামনাউহু আঁইইয়ানকালেবা ইলা আহলিহি ইলাস্ সালাতে"। অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামাযের প্রতীক্ষা কোন ব্যক্তিকে যতক্ষণ আটকে রাখে এবং নামায ছাড়া অন্য কিছু তাকে ঘরে পরিবারের দিকে ফিরতে বাধা দেয় না ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই থাকে' (মুত্তাফাকুন আলায়হে)।

ব্যাখ্যা ঃ

নামায ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, সকল ইবাদতের প্রাণ হলো নামায। নামায মানুষের হৃদয়কে নির্মল ও পরিষ্কার করে। গুনাহ হতে বিরত রাখে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ জানাচ্ছেন, তোমরা নামাযের হিফাযত কর বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের। নামাযের হিফাযতের কথা খোদা এজন্য বলছেন, মানুষ এথেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। নামায পড়ায় মন বসে না অথবা কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়ে আবার নামায ছেড়ে দেয়, আর এমনও হয় যে, বছরের পর বছর নামায পড়েও পবিত্রতা অর্জন হয় না। এজন্য আল্লাহ্তাআলা পবিত্র কুরআনে বার বার বলেছেন, "আকীমূস সালাত" নামাযকে দাঁড় করাও বা নামায কায়েম কর। নামায কায়েম করার অর্থ হলো নামাযের পুরো আচার-অনুষ্ঠানকে নিষ্ঠাবান হয়ে আদায় করা। নামাযের পূর্বে প্রস্তুতি নেয়া। ওযূর আনুষ্ঠানিকতাকে শুদ্ধ চিত্তে পূর্ণাঙ্গীনভাবে আদায় করা এবং নামাযে দাঁড়ানোর আগে ইস্তিগফার তাসবীহ্ ও তাহমীদ পড়া। হৃদয়ে এ বিষয়টি সৃষ্টি করা যে, এখন সর্বশক্তিমান খোদা যিনি রব্বুল আলামীন মালিকি ইয়াওমিদ্দীন তাঁর সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি। তিনি আমার হৃদয়ের খবর জানেন। তাঁর কাছ থেকে আমার কিছুই গোপন নয়। এভাবে যে খোদার সামনে পাঁচ ওয়াক্ত দাঁড়াবে এবং খোদার সামনে আকুতি করবে। সে নিশ্চয় নামাযের স্বাদ পাবে।

হাদীসে নামাযের আদবের একটি দিক তুলে ধরা হয়েছে যে, এক নামায আদায়ের অপর নামাযের দিকে দৃষ্টি রাখা এতে মানুষ খোদাকে নিজের সামনে রাখার সুযোগ পায় এবং সে গুনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যতদিন খোদা তার বান্দাকে জীবিত রাখেন ততদিন তাঁর প্রভুর ইবাদতের প্রতি নিষ্ঠার সাথে মনোযোগ দেয়াই ইবাদতের চরম মার্গ অর্জনের সোপান। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সবাইকে এর তৌফীক দান করুন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

## অমৃতবাণী

# হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

### চশমায়ে মসীহী বা খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব[১]

পাদরী সাহেবদের ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার আর কিছুই লেখার আবশ্যকতা ছিল না কারণ আমাকে যা করতে হত অধুনা তাদের নেতৃস্থানীয় ইউরোপ ও আমেরিকা নিবাসী সুবিজ্ঞ পন্ডিতরাই তা নিজ হাতে গ্রহণ করে খ্রীষ্টান ধর্মের মূলতত্ত্বের উদ্ভাবনার কাজ অতি সূচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু সেদিন বাসবেরেলী হতে একজন অনভিজ্ঞ মুসলমানের এক পত্র এসে উপস্থিত। তিনি তাঁর পত্রে "ইয়া নবিউল ইসলাম" নামক এক পাদরী-প্রণীত পুস্তকের মহা অনিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ মুসলমান উদাসীনতাবশতঃ আমাদের প্রণীত পুস্তকগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে ইতঃস্তত নয় এবং আমাদের উপর খোদাতাআলা যে সম্পদরাজি অবতীর্ণ করেছেন সে সম্বন্ধেই তারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। জ্ঞানহীন মৌলবীরা আমাদেরকে কাফির ও বিধর্মী ঘোষণা করে মুসলমান জনসাধারণ ও আমাদের মধ্যে এক অতি উঁচু দেয়াল প্রস্তুত করে দিয়েছেন। তারা অবগত নন যে, খ্রীষ্টধর্মের প্রতারণা ও প্রলোভন যে সময় আসলে কার্যকরী হত এখন তার অবসানের যুগ আরম্ভ হয়েছে, মানবের আদিপুরুষ আদমের জন্মের ছয় হাজার বছর এখন অতীত প্রায়, এ যুগে ঐশী বিধানের বিজয় লাভ অবশ্যম্ভাবী, আলোক ও আঁধারের এ শেষ যুদ্ধ[২] এতে আলোকের জয় ও প্রাধান্য আর অন্ধকারের চিরপলায়ন সুনিশ্চিত। পাদরী মহোদয়গণের এ ভ্রমবিশ্বাসগুলো সম্বন্ধে কোন পুস্তক রচনা করা অনাবশ্যক হলেও উল্লেখিত ব্যক্তির একান্ত অনুরোধে আমাকে এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখতে হল। খোদাতাআলা একে একান্ত অনুরোধে আমাকে এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখতে হল। খোদাতাআলা একে বরকতপূর্ণ করুন ও মানবজাতির সুপথপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ করুন, আমীন।

স্মরণ রাখবেন, আমরা হযরত ঈসাকে (আঃ) সম্মান করি ও তাঁকে খোদাতআলার নবী বলে বিশ্বাস করি।[৩] ইহুদীরা আজকাল যে সমুদয় প্রতিবাদ প্রচার করেছে, আমরা সবগুলোর সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমি দেখাতে চাই যে, ইহুদীরা যেমন শুধু অন্ধবিশ্বাস ও হঠকারিতায় অভিভূত হয়ে হযরত ঈসা ও তাঁর ইঞ্জীলের ওপর অযথা আক্রমণ করে, খৃষ্টানগণও ঠিক সেভাবে হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর কুরআনের ওপর আক্রমণ করে। ইহুদীদের এ অসৎপথের অনুসরণ করা খৃষ্টানগণের উচিত ছিল না কিন্তু চিরন্তন প্রথা এই, মানুষ সত্য ও ন্যায় পথে থেকে কোন ধর্ম আক্রমণ করতে অসমর্থ হলে অনেকেই অমূলক অপবাদ দ্বারা উক্ত ধর্ম আক্রমণ করতে আরম্ভ করে। 'ইয়া নাবীউল ইসলাম' প্রণেতা ঠিক এভাবেই ইসলাম ধর্মের উপর আক্রমণ করেছেন। সংসার প্রেমেই এ বদভ্যাসের সৃষ্টি হয় নতুবা আধুনিক যুগের উপযোগী ঐশী ধর্ম শুধু ইসলাম ধর্ম। এরই আশীর্বাদ এখনও নূতন ও সজীব অবস্থায় বিদ্যমান; এতে পবিত্র ঝরণার সম্পদরাজি মানবকে জীবিত খোদার সন্নিকটে পৌছিয়ে দিতে সমর্থ; কিন্তু কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর খান্‌ইয়ার ষ্ট্রিটে সমাহিত মানবকল্পিত ঈশ্বর কাউকেও সহায়তা করতে সমর্থ নন। এখন আমি বেরেলীর পত্র লিখককে আহ্বান করে আমার ক্ষুদ্র পুস্তিকা আরম্ভ করছি।

লিখক- **মির্যা গোলাম আহমদ** কাদিয়ানী,
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ
১লা মার্চ,১৯০৬

---

(১) এ নামের অর্থ এই নয় যে, এটা ঈসা নবী বা যিশুখ্রীষ্টের প্রবর্তিত ধর্মের শিক্ষা, কারণ তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হয়েছে, আধুনিক খ্রীষ্টধর্ম ঈসা নবীর ধর্ম নয় এটা পথভ্রান্ত খ্রীষ্টানগণের কাল্পনিক নতুন ধর্ম।

(২) এ যুদ্ধ 'শব্দ' তরবারী বা বন্দুকের যুদ্ধ বুঝায় না, কারণ খোদাতাআলা এখন এরূপে জেহাদ করতে নিষেধ করেছেন; প্রতিশ্রুত মসীহের আগমণকালে এরূপে 'জেহাদ নিষিদ্ধ হওয়া আবশ্যক ছিল, তিনি কুরআনে ইতিপূর্বেই এর সংবাদ দিয়েছেন এবং বুখারীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ সম্বন্ধে এ হাদীসে লিখিত আছে - ইয়াজাউল হারুন

(৩) হযরত ঈসা আলায়হেস্‌ সালামের প্রকৃত সম্মানের প্রতিকুলে আমরা যা লিখেছি, তা শুধু এল্‌যামী জবাব আর কিছুই নয়।

দুঃখের বিষয় যদিও পাদরী সাহেবদের প্রকৃত সভ্যতা ও শিষ্টাচার ও খোদা-ভীতি নেই। আর আমাদের নবী (সঃ)-কে অজস্র পানি বর্ষণ করেন তথাপি মুসলমানগণ তাদেরকে ২০ গুণ সম্মান করুন এরূপভাব অন্তরে পোষণ করুন।

---

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

# আল্লাহ্‌তাআলার সিফত 'নূর' সম্পর্কে ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১২ জুলাই, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহার পর সূরা আহ্যাবের ৪৪নং আয়াত পাঠ করে খুতবা এরশাদ করেছেন।

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٤﴾

অর্থ ঃ তিনিই তোমাদের উপর রহমত নাযেল করেন এবং ফিরিশ্‌তাগণও (তোমাদের জন্য রহমত কামনা করেন); যাতে তিনি তোমাদের অন্ধকাররাশি হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। বস্তুত তিনি মু'মিনদের উপর পরম করুণাময় (সূরাতুল আহযাব ঃ ৪৪)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন বরিদাহ্ (রাঃ) নিজ পিতা হতে রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "আমার সাহাবায়ে কেরাম যে স্থানে মৃত্যু বরণ করবে সে স্থানের মানুষ কিয়ামতের দিন পরিচালক ও নূর হয়ে আবির্ভূত হবে" (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব)।

আল্লামা শাহাবউদ্দীন আলুসী উপরোক্ত আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন, "তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যাবেন" এর অর্থ "তিনি তোমাদেরকে অবাধ্যতার অন্ধকার থেকে আনুগত্যের আলোর দিকে নিয়ে আসবেন।'

আল্লামা তাবরী লিখেছেন, এর অর্থ আল্লাহ্ নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষকে অজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে আসেন (কারণ অজ্ঞতা এবং মুর্খতা অন্ধকারের অনুরূপ এবং কোন কিছু সম্পর্কে সঠিক তথ্য নূর বা আলোর অনুরূপ।

ইবনে যায়েদ বলেছেন, "(এর অর্থ) বিপথগামী হতে হেদায়াতের দিকে নিয়ে আসা"।

মুকাতেল বলেছেন, "কুফরী (অস্বীকার) হতে ঈমানের দিকে আসা"। এ অর্থও করা হয়েছে, 'জাহান্নাম হতে জান্নাতে নিয়ে আসা' একথাও বলা হয়েছে, "কবর হতে উত্তোলন তথা মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান" (তফসীর রূহুল মা'নী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

"মানুষ তার দৈহিক গঠন ও মেধা শক্তির দিক থেকে উন্নত ও চারিত্রিক গুণাবলীর দিক থেকে আলোকিত, আত্মার অধিকারী হওয়ার দিক থেকে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, কোন কোন ব্যক্তি ঐশী বাণী বা আল্লাহ্‌র এলহাম পাওয়ার বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হন

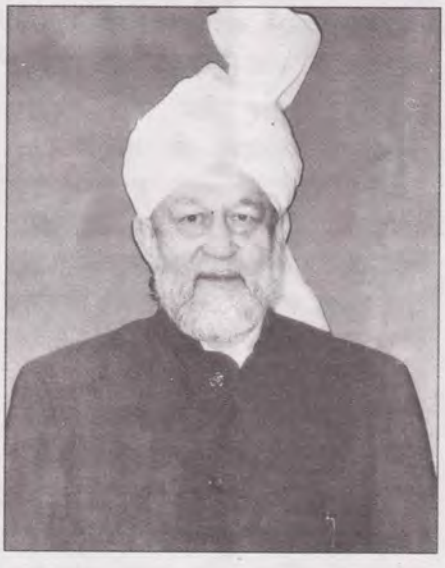

অর্থাৎ যিনি সকল দিক হতে কামেল মু'মিন তিনি এ যোগ্যতার অধিকারী হতে পারেন। কারণ একথা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, প্রত্যেক প্রাণ নিজ নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে ঐশী নূর আহ্বান করে, তার বেশি নয়। এর জন্য সূর্য উত্তম উদাহরণ। যদিও সূর্য যে কোন স্থানে সমানভাবে তার আলো ছড়ায়, কিন্তু সেখানকার গৃহসমূহ সমান আলোর রশ্মি ধারণ করতে পারে না। যে ঘরের দরজাও বন্ধ তার মধ্যে আলো প্রবেশ করে না। তার তুলনায় একটি ছোট ঘরও আলোপ্রাপ্ত হয় যার দেয়ালে ছিদ্র আছে। কিন্তু সামান্য, যা দিয়ে অন্ধকার দূর হয় না। কিন্তু যে ঘরের দরজাগুলো সূর্যের দিকে উন্মুক্ত দেয়ালগুলোও ঘন বা গাঢ় নয় বরং খুব স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল কাঁচের দেয়াল সে ঘরে কেবল প্রচুর আলোই প্রবেশ করবে না বরং এমন ঘর থেকে চারিদিকে আলো ছড়াবে। অন্যদেরকেও আলোকিত করবে। শেষোক্ত গৃহের সাথে আম্বিয়াকেরাম (আঃ)-এর তুলনা করা যায়।" (বারাহীনে আহমদীয়া-১ম খন্ড, পৃঃ ১৮৮)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"ফিরিশ্‌তাগণ এবং রূহুল কুদুস এমন সময় নাযেল হন যখন কোন মহান ব্যক্তিত্ব খেলাফতের পোশাক পরিধান করে আল্লাহ্‌র কালাম (বাণী) প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। রূহুল কুদুস বিশেষ করে খলীফাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র খলীফা)-এর উপর নাযেল হন আর তার সাথে অগণিত ফিরিশ্‌তা পৃথিবীর উপযুক্ত (পবিত্রাত্মা) ব্যক্তিগণের উপর নাযেল হন। এমন সময় পৃথিবীর যেখানে যেখানে যথোপযুক্ত রূহানী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা থাকেন সেখানে তাদের উপর ঐ নূরের প্রতিফলন ঘটে এবং সারা পৃথিবীতে এক নূরের আলোর বিস্ফোরণ ঘটে এবং ফিরিশ্‌তাগণের পবিত্র প্রভাবে পুণ্যবান ব্যক্তিদের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে তাদের ভেতর থেকেই পুণ্যময় পবিত্র চিন্তা-ভাবনা জেগে উঠে এবং এভাবে তাদের কাছে তৌহীদ খুব প্রিয় মনে হয়" (ফতহে ইসলাম, পৃঃ ১২ টীকা)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"দুরূদ শরীফের সুবাদে একবার দেখলাম, আল্লাহ্‌র কল্যাণধারা আশ্চর্যজনকভাবে নূরের আকারে আঁ হযরত (সঃ)-এর দিকে বয়ে যাচ্ছে এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর অন্তঃকরণে প্রবেশ করছে। তারপর হুযূর (সঃ)-এর পবিত্র অন্তর হতে যখন বের হচ্ছে তখন হাজার হাজার নালা হয়ে যাচ্ছে এবং সে সব নালা নূরবাহি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে (হৃদয়ে) যার যেমন ধারণ ক্ষমতা তার কাছে পৌছে যাচ্ছে। এটা খুবই সুনিশ্চিত যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর মাধ্যম ব্যতীত কখনই কোন ব্যক্তি কোন প্রকার কল্যাণ লাভ করতে পারে না। দুরূদ শরীফ কী জিনিস? দুরূদ শরীফ অর্থ এই যে, আঁ হযরত (সঃ) কর্তৃক আল্লাহ্‌র

আরশকে নাড়া দেয়া যার ফলে এ সমস্ত নূরের নালী উৎসারিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কল্যাণধারা এবং অনুগ্রহ লাভ করতে চায় তার উচিত দুরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকা যেন ঐ কল্যাণ ধারায় প্রবাহ্ সৃষ্টি হয়" (আল্ হাকাম, ২৮ ফেব্রুয়ারী-১৯০৩ পৃঃ)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"একবার এমন হয়েছিল, বহুকালব্যাপী আমি হযরত নবীয়ে করীম (সঃ)-এর উপর দুরূদ পড়তে ব্যস্ত ও মগ্ন থাকতাম। কারণ আমি জানতাম যে, আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হবার পথ খুবই সরু ও চিকণ। আঁ হযরত (সঃ)-এর মধ্যস্থতা ব্যতীত যার প্রাপ্তি অসম্ভব। যেমন আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, **ওয়াবতাগু ইলায়হিল ওসীলাহ্** (তোমরা তাঁর প্রতি অগ্রসর হবার জন্য মাধ্যম অবলম্বন কর।) ঐ যুগে দীর্ঘ দিন পরে, কাশ্‌ফের জগতে দেখেছিলাম, দু'জন পানি বহনকারী আসলেন। একজন বাইরের পথ ধরে একজন ভেতরের পথ ধরে। আমার গৃহে তারা দু'জন প্রবেশ করলেন। তাদের কাঁধে নূরের মশক ছিল। তারা বলছিলেন ঃ "হাযা মা সাল্লায়তা 'আলা মুহাম্মাদীন" (এগুলো সেই দুরূদ শরীফের কল্যাণে যা তুমি আঁ হযরত (সঃ) উদ্দেশ্যে পাঠ কর) (হাকীকাতুল ওহী, পৃঃ ১২৮ টীকা)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর ফার্সী দুররে সামীন হতে কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ "তিনি ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের নূর, আমি তাকে চিনেছি। সবকিছুই দেহ, তুমিই এক মাত্র প্রাণ, আমি তোমাকে চিনেছি" (আল্ ফযল; ১৯ জুন, ১৯১৩ইং)।

হে আমার প্রিয়! হে আমার পরিচালক। হে আমার অন্তর্যামী! হে জগতের প্রাণ! নূরের নূর! তুমি তো অদৃশ্য! কিন্তু তোমার মহিমা প্রকাশিত! তুমি লুকায়িত, কিন্তু তোমার কার্যক্রম প্রকাশিত। তুমি দূর, কিন্তু প্রাণের চেয়েও নিকটে। তুমি নূর! কিন্তু অন্ধকার রাতের চেয়েও গোপন। তোমার সৌন্দর্য দেখবার জন্য প্রত্যেক বস্তুকেই আমি আয়নার আকারে পাচ্ছি। প্রত্যেক কণায় কণায় তোমার নূরের বিকাশ ঘটছে প্রত্যেক বিন্দু হতে তোমার মহিমার ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। আমি তোমার যিক্‌র এর মাধ্যমে ক্রন্দনরত তোমার ভক্তদের জামাতের মধ্যে তোমার নূর দেখছি" (সূরমা চশমায়ে আরিয়া)।

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾

অনুবাদ ঃ তবে কে যার অন্তরকে আল্লাহ্ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেছেন এবং যে তার প্রতিপালকের নিকট হতে (সমাগত) জ্যোতির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে সে কি (ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে? না এমন হয় না)? সুতরাং তাদের জন্য দুর্ভোগ যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে কঠোর। ওরাই প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে আছে (সূরাতুয্ যুমার ঃ ২৩)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আম্‌র (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন আঁ হযরত (সঃ) একদিন নামাযের কথা বললেন, 'যে নামাযের হেফাযত করবে- তার জন্য কিয়ামতের দিন নামায নূর হবে, দলিল হবে এবং মুক্তির কারণ হবে। যে এর হেফাযত করবে না, তার জন্য কোন নূর, কোন দলিল, কোন কিছু মুক্তির উপায় হবে না। এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন, কারুন, ফেরাউন, হামান এবং ওবাই বিন খল্‌ফ এর সঙ্গী হবে' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

হযরত বুরায়দা আসলামী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "অন্ধকারের মধ্যে যারা বেশি বেশি হেঁটে মসজিদে যায়, তাদেরকে শুভ সংবাদ দিয়ে দাও যে, "তারা কিয়ামতের দিন পূর্ণমাত্রায় নূর লাভ করবে" (তিরমিযী, কিতাবুস্ সালাত)।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী আলোচ্য আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এখানে নূর অর্থ হেদায়াত এবং মা'রেফত (ঐশী-তত্ব জ্ঞান)।

যতক্ষণ হৃদয় উন্মুক্ত না হয় নূর সৃষ্টি হতে পারে না। যদি অন্তরে পার্থিব জগতের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়- তবে দলিল শুনে কোন উপকার হয় না। বরং কখনও দলিল শুনে হৃদয় কঠিন ও শক্ত হয়ে যায় এবং ঘৃণার উদ্রেক হবার কারণ হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনে হাইয়্যান (আন্দালুসী) লিখেছেন,

শারাহ্ সদর বা উন্মুক্ত হৃদয় এর অর্থ হৃদয়ের মধ্যে ঈমান; উত্তম জিনিস বা মঙ্গল, নূর ও হেদায়াত প্রবেশ করা। আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, "ইনশেরাহ্ সাদ্‌র কীভাবে লাভ করা যায়'। আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন, 'যখন নূর হৃদয়ে প্রবেশ করবে তখন ইনশেরাহ্ এবং প্রশান্তি লাভ হয়ে যাবে।" আমরা আরো জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমরা কীভাবে বুঝতে পারব? চিহ্ন কী হবে? হুযূর (সঃ) বলেছেন, সদা সর্বদার ঘর অর্থাৎ পরকালের দিকে ঝুঁকে থাকা এবং পার্থিব জগতের আকর্ষণ থেকে নির্লিপ্ত থাকা এবং মৃত্যুর সময় এসে যাবার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা (বাহরে মুহীত)।

আল্লামা ইবনে হাইয়্যান আরো লিখেছেন, "এখানে নূর অর্থ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বুঝায়। এখন অনুগ্রহ যা আঁ হযরত (সঃ)-এর মধ্যে আল্লাহ্‌র রহমতের নিদর্শন আকারে প্রকাশ পেয়েছিল, যখন হুযূর (সঃ)-এর উপর এমন নিদর্শন নাযেল হোত তখন যা তাঁর উপর আরোপিত হোত যদ্বারা সত্যের প্রতি হেদায়াত লাভের সৌভাগ্য হয়" (রূহুল মা'নী)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ অন্তরে নূর লাভ করে আল্লাহ্‌তাআলা তার সততা, তার আন্তরিকতাকে প্রকাশ করে দেন। যার অন্তরে অপবিত্রতা ও শয়তানী লুকিয়ে থাকে তা-ও আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেন। এবং কোন কথাই গোপন থেকে যায় না" (আল্ হাকাম, ১০ই জানুয়ারী, ১৯০৬ইং, পৃঃ ৫)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

নিদর্শন এবং মু'জিযা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য খুব স্পষ্ট হয় না যে দেখার সাথে সাথে সে অবশ্যই স্বীকার করে নিবে। বরং নিদর্শন দেখে কেবল তারাই লাভবান হয় যারা বুদ্ধিমান, ন্যায়-বিচার ক্ষমতার অধিকারী; ন্যায়পরায়ণ ও সৎকর্মশীল। এরা নিজ প্রখর দূরদর্শিতা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি-শক্তি, ন্যায় বিচারের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে এবং খোদাভীরুতা, তাকওয়ার দৃষ্টি দিয়ে দেখে নেয় যে, এ ঘটনাবলী পৃথিবীর অন্যান্য ঘটনার মত নয় আর কোন মিথ্যাবাদী এমন নিদর্শন নিজ থেকে সৃষ্টি করতে পারে এবং তারা বুঝে নেয় যে, এ ধরনের নিদর্শন কোন

মানুষের দ্বারা বানানো সম্ভব নয় এবং মানুষের প্রচেষ্টা অনেক উর্ধ্বে। এসব ঘটনার মধ্যে (মুজিযা বা নিদর্শনের মধ্যে) এমন কিছু চিহ্ন বা আলামত থাকে যা মানবীয় ক্ষমতা ও পরিকল্পনার দ্বারা সম্ভব না। তারা তাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও নূরানী দৃষ্টি বলে এর গভীরে দেখে নেয় যে, এর মধ্যে একটি নূর নিহিত আছে এবং আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপের সুগন্ধ রয়েছে যার মধ্যে কোন চালাকী বা কোন ধোঁকার সন্দেহ করা যায় না। সুতরাং সূর্যের আলোর উপর বিশ্বাস আনতে হলে যেমন সূর্যের আলোই যথেষ্ট নয় বরং চোখেও দৃষ্টি-শক্তি থাকা আবশ্যক যেন সে সূর্যের আলোকে দেখতে পারে। ঠিক তদ্রূপ মু'জিযার উপর বিশ্বাস আনতে হলে কেবল মু'জিযার বিকাশ বা প্রদর্শন যথেষ্ট নয় বরং মু'জিযা দেখার মত হৃদয়ে নূর থাকাও আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত সে, যে দেখবে তার প্রকৃতির মধ্যে সঠিক দর্শনশক্তি এবং নূর বিশিষ্ট সুবুদ্ধি না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণতঃ মু'জিযা দেখে সে নিশ্চিত হতে পারে না। সে বার বার প্রশ্ন করবে যে, এমন মু'জিযা আমি জানি না। যদি না সে মু'জিযা কিয়ামত সদৃশ হয়" (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৪৫)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

হে অমুক ব্যক্তি! তুই কুরআন শরীফকে প্রত্যাখ্যান করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিস্। বিদ্রোহ ও ধ্বংসের গর্তে পা রেখেছিস্। তুই হেদায়াতের নূরের সামনে এমন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিস্ না এবং ঠাট্টা ও হাসি-তামাশা করা হতে তওবা কর! ঐ চোখ কেমন অন্ধ ও হতভাগ্য যা সূর্যের আলোর সামান্য অংশও দেখতে পারে না! সূর্য যখন উজ্জ্বল হয়ে আকাশে উদিত হয়েছে- তখন তুই কীভাবে এ সূর্যকে মাটি ও ঘাস দিয়ে ঢেকে দিতে পারিস? কুরআনের নূর এমনভাবে ঝলমল করে না যে, যারা দেখতে চায় তাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। এ তো সমগ্র পৃথিবীর জন্য হেদায়াতের প্রদীপ এবং পৃথিবীর সকলের পথপ্রদর্শক ও দিকনির্দেশক, যে এর মহিমাকে দেখে ফেলে তার তো তখনই খোদা স্মরণ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি অহংকার ও শত্রুতাবশতঃ এর আলোকে দেখে না সে তো অন্ধ এবং আল্লাহ্‌র নূর হতে বহু দূরে।

কুরআন তো আল্লাহ্‌র প্রতাপশালী নূরে পরিপূর্ণ উজ্জ্বল-সূর্যের সামনে মাটিতুল্য। সাবাস! কত শত ধন ভান্ডর, ঐশী রহস্য এর মধ্যে লুকায়িত আছে। আমার অন্তর আমার প্রাণ তো কুরআনী নূরের সামনে কুরবানী হচ্ছে। কুরআন আল্লাহ্‌র চেহারা দেখার জন্য আয়না। সে তো এক বিরাট বড় সংখ্যার মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। যখন তাদের মধ্যে এর পবিত্র নূর প্রবেশ করেছে তখন তাদের মধ্যে পুর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে - যার আলো অন্ধকারের আস্তরণসমূহ দূরীভূত হয়েছে। এবং তারা সরাসরি আলোকময় সত্তায় পরিণত হয়েছেন। ফলত তারা আল্লাহ্‌কে পেয়ে গেছেন। যখন তাদের মধ্য হতে তাদের আমিত্ব দূরীভূত হয়েছে তখন সেখানে খোদা বিকশিত হয়েছেন। এরা সবাই ঐ খোদা যিনি 'লা শরীক' -এর প্রেমে মত্ত, এরা আল্লাহ্‌র কালাম (কুরআন) হতেই নূর লাভ করে থাকেন।

আল্লাহ্ মানব জাতির উদ্দেশ্যে একজন নূরান্বিত অস্তিত্বকে প্রেরণ করে থাকেন যার নূরে অন্ধকার দূরীভূত হয়। আল্লাহ্‌র ইলহামের নূর প্রভাবের বায়ু প্রবাহের মত অদৃশ্য হতে সুগন্ধ বয়ে আনে। এভাবে আমাদের দয়ালু খোদা, পবিত্র ও কাদের খোদা ঐ ব্যক্তিকে নূরান্বিত করে দেন"(বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খন্ড)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আরবী দুররে সামীন থেকে ঃ "হে আমার প্রিয় প্রভু! আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হও আমার অন্তরের মধ্য হতে প্রকাশিত হও আমি লুণ্ঠিত হবার পর।

আমার অন্তরকে মারেফতের নূর দিয়ে ভরে দাও হে আমার প্রিয় প্রভু! তুমিই আমার একমাত্র কাম্য উদ্দেশ্য অতএব আমার কাম্য আমাকে দিয়ে দাও।" (ইজাযুল মসীহ্, রূহানী খাযায়েন নং ১৮, পৃঃ ২০৩)।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ১৬ আগষ্ট, ২০০২ইং)

অনুবাদ - মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

## ঈদুল-ফিতরের খুতবা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৭ ডিসেম্বর, ২০০১ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আকদস (আইঃ) সূরা আল্ মায়েদার ১৭তম আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۷﴾

অর্থ ঃ 'আল্লাহ্ এ (কুরআনের) দ্বারা তাদেরকে যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, শান্তি ও নিরাপত্তার পথসমূহের দিকে হেদায়াত দান করেন এবং তাঁর আদেশে তাদেরকে আঁধার থেকে বের করে জ্যোতির দিকে নিয়ে আসেন আর তাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে হেদায়াত দেন।'

এরপর হুযূর বলেন, আজকের খুতবা আল্লাহ্‌তাআলার গুণবাচক নাম 'আস্ সালাম' কে কেন্দ্র করে প্রদান করা হবে। হুযূর বলেন, আজ 'আস্ সালাম' (শান্তি) সবার ওপর বর্ষিত হোক- সকল ই'তিকাফকারী, সকল বিশ্ববাসী ও সকল আহমদীকে আমাদের পক্ষ থেকে 'আস্‌সালামু আলায়কুম'

এরপর হুযূর (আইঃ) কয়েকটি কুরআনী আয়াত ও আরবী ভাষার অভিধানের আলোকে 'সালাম' শব্দের অর্থ বর্ণনা করেন এবং 'সালাম' সম্পর্কে নবী করীম (সঃ)-এর বিভিন্ন পবিত্র হাদীস উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমে এ হাদীসটি তুলে ধরেন ঃ হযরত নবী করীম (সঃ) বলেন, 'মুসলমান হলো সে

ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত (অর্থাৎ কথা ও কাজ)-এর দিক থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, আর মুহাজির হলো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র নিষেধকৃত বিষয়াবলীকে ত্যাগ করে আর সেসব বিষয়ের দিকে হিজরত করে যাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন।'

দ্বিতীয় হাদীসটি হুযূর (আইঃ) বুখারী শরীফের 'কিতাবুল মাযালিম' থেকে বর্ণনা করেন। আঁ হযরত (সঃ) বলেন, 'যদি কেউ তার ভাইয়ের প্রতি তার ইজ্জতের বা অন্য কোন ক্ষেত্রে কিছু সীমালঙ্ঘন করে থাকে তাহলে সেদিন আসার আগে আজই (তার প্রতিকার করে) যেন তার হিসাব চুকিয়ে দেয়, যে দিন তার কাছে কোন দিনার ও দিরহাম (টাকা-পয়সা) থাকবে না। তখন তার কিছু নেক আমল বা পুণ্য থাকলে তা থেকে তার সীমালঙ্ঘনের সমান অংশ নিয়ে নেয়া হবে। আর যদি তার আমল নামায় কোন নেক আমল না থাকে তা হলে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপ তুলে নিয়ে সীমালঙ্ঘনকারীর ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।'

হুযূর (আইঃ) এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। সেগুলোর দু'টি নিম্নে দেয়া হলো ঃ হযরত মসীহ্ (আঃ) বলেন ঃ "ইসলামের হাকীকত (মূলতত্ত্ব ও প্রকৃতস্বরূপ) হলো অতি উচ্চ ও উৎকৃষ্ট মানের, এবং কোন মানুষ কখনও এ সুমহান উপাধি 'আহ্‌লে ইসলাম' তথা 'মুসলিম'-এর দ্বারা ততক্ষণ যথার্থরূপে ভূষিত হতে পারে না যতক্ষণ সে তার সমস্ত অস্তিত্বকে এর যাবতীয় ক্ষমতা, শক্তি ও ইচ্ছা-কামনা সহ খোদাতাআলার নিকট সমর্পণ করবে না এবং নিজের আমিত্ব ও অহমিকা এবং যাবতীয় আনুষঙ্গিক বিষয়াদি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণমুক্ত করে তাঁরই পথে আত্মনিয়োজিত হয়ে পড়বে না। অতএব প্রকৃতভাবে কাউকে তখনই মুসলমান বলা যাবে যখন তার উদাসীন জীবনের উপর ভীষণ এক বিপ্লব উপস্থিত হয়ে তার কুপ্ররোচণাকারী আত্মা (নফ্‌সে-আম্মারা)-এর অস্তিত্বের চিহ্ন এর যাবতীয় আবেগ উত্তেজনা সহ সম্পূর্ণ মুছে যায়, আর এই মৃত্যুর সে 'মুহ্‌সিন লিল্লাহ্' (আল্লাহ্‌রই জন্য সৎকর্মপরায়ণ) হওয়ার দরুন তার মধ্যে নব জীবনের উন্মেষ ঘটে। বস্তুত তা এরূপ এক পবিত্র জীবন যাতে স্রষ্টার আনুগত্য ও সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।"

এরপর হুযূর (আইঃ) সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি উপস্থাপন করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "এখন মসীহ্ মাওউদের যুগ এসে গেছে। এখন অবশ্যই আল্লাহ্‌তাআলা আকাশে এরূপ উপকরণ সৃষ্টি করে দেবেন, পৃথিবী যে জুলুম অত্যাচার ও অযথা অন্যায় রক্তপাতে ভরে গিয়েছিল তৎপরিবর্তে এখন তা ন্যায়বিচার, শান্তি ও সন্ধি সমঝোতায় ভরে যাবে, মুবারক (ধন্য) ঐ সকল সম্পদশালী লোক ও রাজা-বাদশা, যারা এথেকে কিছু অংশ গ্রহণ করবেন।"

এরপর হুযূর (আইঃ) আল্লাহ্‌তাআলার গুণবাচক নাম 'আস্ সালাম' সম্পর্কেই সূরা হাশ্‌রের ২৪তম আয়াত তিলাওয়াত করে এর অর্থ বর্ণনা করেন।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

অর্থ ঃ 'তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনি বাদশা, পবিত্র, সালাম, শান্তি প্রদানকারী, তত্ত্বাবধায়ক, পরম পরাক্রমশালী, ভেঙ্গে যাওয়া কাজের প্রতিকার ও সুসমাধাকারী (ও) সার্বিক মাহাত্ম্যের অধিকারী। যা তারা শির্ক করে তার উর্ধ্বে, পরম পবিত্র।'

এরপর হুযূর এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে শুনান। তিনি (রাঃ) বলেন, "ইসলামের প্রকৃত উৎসমূল হলো আল্লাহ্‌তাআলার সে পবিত্র সত্তা, যাঁর (গুণবাচক) নাম হচ্ছে 'আস্ সালাম'"

হুযূর (আইঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ যে সব ইলহামে তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা 'আস্ সালাম' শব্দ ব্যবহার করেছে তার কয়েকটির কথা উল্লেখ করেন।

অতঃপর হুযূর ঈদুল ফিত্‌র সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি খুতবা পড়ে শুনান। তারপর কিছু হাদীস বর্ণনা করেন।

কীভাবে রসূল করীম (সঃ) আনন্দ উৎসব ও জন সমাবেশের উপলক্ষগুলোকেও 'যিকরে ইলাহী' দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন, অথচ অন্যান্য জাতির আনন্দ ও সমাবেশ উপলক্ষ্যগুলো এথেকে সম্পূর্ণ খালি- এ বিষয়ে হুযূর (আইঃ) ঈদ সম্পর্কে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করেন।

এরপর তিনি (আইঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। যেগুলোতে একে অন্যের প্রতি সাহায্য সহযোগিতা, সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে, বিশেষতঃ শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী ও সম্পদশালী ব্যক্তিরা যেন গরীব ও দুর্বল ভাইদের ভার বহন করেন - এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পরিশেষে হুযূর (আইঃ) বলেন, এখন আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনারা নিজ ঈদের আনন্দে আপনাদের গরীব ভাই-বোনদেরকেও অবশ্যই শামিল করুন। আমি সর্বদাই এ ঈদ উপলক্ষ্যে এ উপদেশ দিয়ে আসছি। ধনীরা যদি নিজ সন্তানদের ছাড়াও, গরীবদের বাড়ীতে গিয়ে তাদেরকেও ঈদের উপহার (টাকা-কড়ি ইত্যাদি) দেন, তাহলে তাদের মন বড়ই কৃতজ্ঞতা ভরে তাঁদেরকে দোয়া দেবে। এ সব দোয়া অবশ্যই কবুল হবে। তাদের ঘরে ধনীদের যাওয়াটাই তাদের জন্য এক মর্যাদার ব্যাপার হয়ে থাকে। অতএব আপনারা নিজ গরীব ভাইদের ঘরে যান ও তাদেরকে ঈদের মোবারকবাদ দিন, আর সামর্থ্য অনুযায়ী উপহার বিতরণের মাধ্যমে তাদেরকেও ঈদ উপলক্ষ্যে নিজেদের আনন্দে শামিল করুন। সবশেষে হুযূর (আইঃ) সারা বিশ্বের জামাতকে ঈদ মোবারকবাদের বাণী প্রদান করেন এবং বলেন, সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হচ্ছেন আমাদের 'রাহে মৌলা বন্দীগণ'। হুযূর বলেন, সারা বিশ্বে যে জামাত কোটি কোটি সংখ্যায় বেড়ে চলেছে, এসব তাদেরই বরকত ও আশিস।

হুযূর (আইঃ) অশ্রুসজল চোখে অত্যন্ত ব্যথা ভরা কণ্ঠে বলেন, মাত্র এ কয়েকজন বন্দীর কুরবানীই আমাদের কাজে লাগছে। তাদের জন্য অবশ্যই দোয়া করুন, আর আহমদীয়তের শহীদগণের উত্তরসূরী পরিবার-পরিজনের জন্যও। এদের সকলকে নিশ্চয়ই নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখুন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবার রক্ষক ও সহায়ক হোন। (আমীন)

[সাপ্তাহিক 'বদর কাদিয়ান, ২৭ ডিসেম্বর, ২০০১ইং]

অনুবাদ ঃ **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ,**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

# বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

**(১৬-০৪-০২ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত ও অনূদিত)**

**প্রশ্ন নং ১ ঃ** একটি হাদীস - যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার জন্য ঘর বানায় আল্লাহ্‌তাআলাও তার জন্য জান্নাতে ঐ রকম ঘর বানান। প্রশ্ন হলো ঐ রকম অর্থ কি?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** মুসলিম শরীফের এ হাদীসটির ঐ রকম ঘর অর্থ পার্থিব ঘরের মত নয়। জান্নাতের সব কিছু হবে ভিন্ন ধরনের। এটি একটি আধ্যাত্মিক বিষয়। এর মূল অর্থ হলো যে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র জন্য ঘর (মসজিদ) বানায় আল্লাহ্‌তাআলা তার জন্য জান্নাতে উৎকৃষ্ট ঘর বানাবেন।

**প্রশ্ন নং ২ ঃ** সূরা হিজরের ৬৬ আয়াতে বলা হয়েছে- 'সুতরাং তুমি রাতের (শেষের) কোন অংশে নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ে চলে যাও। এবং তুমি নিজে তাদের পেছনে অনুসরণ কর। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনের দিকে না তাকায়'। প্রশ্ন হলো আয়াতের 'তুমি নিজে তাদের পেছনে অনুসরণ কর' এবং 'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরে না তাকায়'। কথা দু'টি একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** পিছনে ফিরে না তাকাবার অর্থ, এটা আযাবের স্থান এটার দিকে তোমরা ফিরেও তাকাবে না। এ স্থানের সাথে কোন প্রকারের সম্পর্ক রাখবে না। 'তুমি তাদের পশ্চাতে অনুসরণ কর' - অর্থ দ্বারা নবীদের কাজ বুঝিয়েছে। তারা সব সময় তাদের অনুসারীদের পেছনে থেকে তাদেরকে সঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনেও এরূপ ঘটনা রয়েছে। সিয়ালকোটে একটি বাড়ীতে তিনি ছিলেন। সেই বাড়ীর ছাদটি কোন কারণে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে তিনি টের পান। তার সাথীরা গভীর ঘুমে ছিলেন। তিনি বাড়ীর অন্যান্য লোককে একে একে বের করে সবশেষে তিনি বের হন। পরে ঘরের ছাদটি মেঝেতে ধ্বসে পড়ে। এটি নবীদের সুন্নত। মানব জাতির প্রতি তাদের যে সহজাত ভালবাসা থাকে এটা তার দিকে ইঙ্গিত করছে।

**প্রশ্ন নং ৩ ঃ** নবীদের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন কোন লেখকের লেখা থেকে জানা যায় যে, তারা কেউ শত শত এমন এমন কি হাজার বছরও বেঁচে ছিলেন। এর আসল তাৎপর্য কি?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** কেবলমাত্র নূহ্ (আঃ)-এর বয়স সম্বন্ধে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা তাঁর ব্যক্তিগত বয়স বুঝায় না। এর দ্বারা তার শরীয়তের বয়স বুঝায়। নূহের শরীয়ত ৯৫০ বছর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও ৬০ বছর পর্যন্ত নূহ্ (আঃ)-এর শরীয়তের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। একথা কুরআনের অন্য স্থানে উল্লেখ রয়েছে। নবীদের দীর্ঘ বয়সের কথা যে উল্লেখ করা হয় এটা তাদের শরীয়তের বয়স। ব্যক্তিগত বয়স না। অন্যান্য অনেক নবী সম্বন্ধে যে অস্বাভাবিক বয়সের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা বানিয়ে বানিয়ে বলা হয়েছে।

**প্রশ্ন নং ৪ ঃ** রেডক্রস, রেডক্রিসেন্ট, ডায়াবেটিস সোসাইটি প্রভৃতি সংগঠন লটারীর মাধ্যমে যে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য।

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এটা বৈধ নয়। যদি আর্ত মানবতার সেবায় ব্যবহৃত হয় তাহলে তার অনুমতি রয়েছে।

**প্রশ্ন নং ৫ ঃ** এবিসি-এর এক প্রোগ্রামে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা যেন ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব না করেন।

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** যে ভিত্তিতে এ প্রশ্ন করা হয়েছে এ ভিত্তিটিই মিথ্যা। কুরআন করীম এবং ইসলাম এটা নিষেধ করে। অনেক ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্ব রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহুদীরা মুসলমানদেরকে ঘৃণা করে। ঘৃণা ও ভালবাসার বিষয়টি আপেক্ষিক। কেউ আপনাকে ঘৃণা করলে আপনারও তাকে ঘৃণা করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু কেউ প্রেম-প্রীতি ভালবাসা দেখালে তার সাথেও আপনার তদনুরূপ ব্যবহার করতে হবে। কেউ যদি আপনার প্রতি সন্ধির হাত বাড়ায় তাহলে তার সাথে ঘৃণাভাব পোষণ করার আপনার কোন অধিকার নেই।

**প্রশ্ন নং ৬ ঃ** আমরা যদি হিন্দুদের অনুষ্ঠানে যাই আর তারা যদি কোন খাবার পরিবেশন করে তবে তা খাওয়া যাবে কিনা।

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** এটা নির্ভর করে কি ধরনের খাবার তারা পরিবেশন করে তার ওপরে। যদি তারা শুধু মিষ্টি বিতরণ করে তা নিষেধ নয়। যদি কোন মাংস তারা উপস্থাপন করে তাহলে তা খাওয়া যাবে না।

**প্রশ্ন নং ৭ ঃ** মানুষ যখন ঘুমায় তখন তার আধ্যাত্মিক অবস্থা কী রকম হয়?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** যদি ঘুমাবার সময় কোন ব্যক্তি যিক্‌রে ইলাহী করতে করতে ঘুমায় এবং সে অবস্থায় যদি সে আল্লাহ্‌র নিকট চলে যায় তাহলে আশা করা যায় যে, সে জান্নাতে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

**প্রশ্ন নং ৮ ঃ** জীবনের উৎপত্তি কি এ গ্রহ থেকে না অন্য গ্রহ থেকে।

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** জীবনের উৎপত্তি আমাদের এ পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে। অন্য কোন গ্রহ থেকে আসে নি।

**প্রশ্ন নং ৯ ঃ** কুরআন শরীফ বিশ্বকিতাব হবার দাবী করে কি?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** হ্যাঁ। কুরআন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে এ দাবী করে যে, কুরআন বিশ্বকিতাব। লিল 'আলামীনা নাযী-রা, ইন্নী রসূলুল্লাহে ইলায়কুম জামিয়া-দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়।

**প্রশ্ন নং ১০ ঃ** কুরআন করীমে 'ব্লাক হোল'-এর কথা আছে কি?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** আমার 'Revelation' পুস্তকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলা আছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে এ পুস্তক -খানা পাঠ করো। পৃথিবী ধ্বংস হবে আবার

আল্লাহ্‌তাআলা একে পুনঃ সৃষ্টি করবেন।

**প্রশ্ন নং ১১ ঃ** গুপ্তচর বৃত্তির জন্যে ইসলামে কোন শাস্তি আছে কি?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** অবশ্যই। গুপ্তচর বৃত্তি তো উভয় দিক থেকে হয়ে থাকে। যদি তুমি তোমার বিরুদ্ধদলের গুপ্তচরকে শাস্তি দাও তাহলে বিরুদ্ধ দলও তোমার গুপ্তচরকে শাস্তি দিবে।

**প্রশ্ন নং ১২ ঃ** আকাশ কী?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** আকাশ হলো শূন্য স্থান।

**প্রশ্ন নং ১৩ ঃ** নামাযের হাত বাঁধার কত প্রকার রীতি আছে।

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** হুযূর (আইঃ) নামাযে হাত বাঁধার বিভিন্ন রীতি দেখান।

**প্রশ্ন নং ১৪ ঃ** হুযূর 'ইসমে আযম' বলতে কী বুঝায়?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** 'ইসমে আযম' অর্থ সবচে' বড় বা মহান নাম। তাই ইসমে আযম হলেন আল্লাহ্‌। বিভিন্ন বুযূর্গ বিভিন্নভাবে ইসমে আযম বলেছেন। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আইঃ) বলেছেন, তাকে জানানো হয়েছে এটা ইসমে আযম-রব্বি কুল্লু শায়ঈন খাদিমুকা রববী ফাহফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা।

**প্রশ্ন নং ১৫ ঃ** ইবলীসকে কেন 'ইবলীস' বলা হয়?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** 'ইবলীস' অর্থ হলো, যে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে।

**প্রশ্ন নং ১৬ ঃ** বর্তমান কালের শিশু অপরাধের ব্যাপারে পুলিশ কিছু করতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে ইসলামের সমাধান কি?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** ইসলামের শিক্ষানুযায়ী অপরাধের প্রকৃতির ওপরে শাস্তি হয়। বয়সের ভিত্তিতে শাস্তির ব্যতিক্রম করা হয় না। কোন নাবালক ছেলে যদি কাউকে খুন করে তাহলে তাকে একজন খুনীর শাস্তিই দেয়া হবে।

**প্রশ্ন নং ১৭ ঃ** হাদীস থেকে জানা যায় হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এ উম্মতের শেষ খলীফা। এর অর্থ কী?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) যখন আবির্ভূত হয়েছেন তখন থেকে ১ হাজার বছরের জন্যে তিনি হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর খলীফা হবেন। তাঁর পর এ উম্মতে আর প্রত্যেক শতাব্দীতে আগের মত কোন মুজাদ্দিদ আসবে না। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-ই রসূলে করীম (সঃ)-এর আনুগত্যে খলীফা থাকবেন।

**প্রশ্ন নং ১৮ ঃ** মরণের পর আত্মা কোথায় যায়?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** মরণের পর আত্মা বরযখের (বা মধ্যবর্তী) জগতে যায়। সেখানে আত্মা ঘুমের মত থাকে। কেয়ামত দিবসে এ আত্মাকে পুনরায় জাগ্রত করা হবে।

**প্রশ্ন নং ১৯ ঃ** গ্যাষ্ট্রিক কী?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** গ্যাষ্ট্রিক শব্দের অর্থ হলো পেটের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সব কিছু। আর গাষ্ট্রাইটিস অর্থ পেটের বিভিন্ন রোগ বা ব্যথা।

**প্রশ্ন নং ২০ ঃ** চাঁদ দেখে যে দোয়া করা হয়- আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলায়না বিল আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস্‌ সালামাতি ওয়ান ইসলামি রব্বী ওয়া রব্বুকালাহু- চাঁদ দেখার সাথে এর কী সম্পর্ক?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** চাঁদ দেখার যে দোয়া শিখিয়েছেন তার অর্থ, হে আল্লাহ্‌! একে আমাদের জন্যে নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের চাঁদরূপে উদিত কর। আমার প্রভু আর (হে চাঁদ) তোমার প্রভূ-আল্লাহ্‌।

এ দোয়ার সাথে চাঁদ দেখার সম্পর্ক রয়েছে; একটি হলো অন্ধকারের পরে তোমাদের জন্যে যে শুভ আলোর উদ্ভব হয়েছে তা আবার অন্ধকার হয়ে যেতে পারে তাই হুযূর (সঃ) দোয়া শিখিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা দোয়া করো যেন এ আলো প্রাপ্তির পরে আমরা অন্ধকারে ফিরে না যাই। আমরা যেন ইসলাম ঈমান ও শান্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি।

**প্রশ্ন নং ২১ ঃ** মুসলমান পুরুষদের জন্যে স্বর্ণ ব্যবহার নিষিদ্ধ; কিন্তু রসূলে করীম (সঃ)-এর হত্যার প্রচেষ্টাকারী সুরাকার জন্যে হযরত রসূলে করীম (সঃ) কেন পারস্য রাজের স্বর্ণ বলয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** এটি আসলে রসূলে করীম (সঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো। একটি সময় আসবে যখন পারস্য বিজয় হবে তখন সেই পারস্য রাজের স্বর্ণ বলয় তাকে পরানো হবে। পারস্য বিজয় হলে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও বরকতস্বরূপ সুরাকাকে এ বালা দেয়া হয়। তিনি ২/১ বার হয়ত পরেছেন। সব সময় পরেন নি।

**প্রশ্ন নং ২২ ঃ** হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর জামাটা তাঁর ভাইদের দিয়ে দেন। এ জামাটি দেখে তার পিতার চোখ ভাল হয়ে যায়। এর আসল তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** হযরত ইউসুফ (আঃ) জামাটি দিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি জীবিত আছেন। পূর্বে তার ভাইয়েরা তাঁর নিকট একটি রক্তমাখা জামা এনেছিলো এটা বুঝানোর জন্যে যে, ইউসুফকে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে। সুতরাং এ জামা পাঠিয়ে ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতাকে এটা বুঝাতে ছিলেন যে, তিনি জীবিত আছেন।

**প্রশ্ন নং ২৩ ঃ** কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আছে মৃত্যুর পর পাপীরা অনন্তকাল দোযখে থাকবে। সেখানে 'আবাদা' (চিরকাল) শব্দের ব্যবহার হয়েছে অথচ সূরা বাইয়্যেনাহ্‌-তে 'আবাদা' শব্দ ব্যবহার হয় নি। বেহেশতে থাকার সময় 'আবাদা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দোযখের বেলায় 'আবাদা' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় চিরকাল বুঝায় না কি। হুযূর বিষয়টি বিস্তারিত বুঝিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** কুরআন শরীফে জান্নাতী ও জাহান্নামী লোকদের প্রেক্ষাপটে এ 'আবাদা' শব্দটি জান্নাতের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং জাহান্নামের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। জাহান্নামীদের প্রসঙ্গে যখন 'আবাদা' শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হবে তারা কয়েক দশক বা দীর্ঘকাল জাহান্নামে থাকবে আর যখন জান্নাতীদের ব্যাপারে ব্যবহৃত হবে তখন এর অর্থ হবে চিরকাল। মানুষ যখন কষ্টের মধ্যে থাকে তখন সে সময়টা অনেক দীর্ঘ বলে মনে হয়, শেষই হতে চায় না। এ দৃষ্টিকোণ হোক জাহান্নামীদের জন্যে 'আবাদা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। জান্নাত সম্বন্ধেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর জান্নাত সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এ নেয়ামত কখনও কর্তিত হবে না, শেষ হবে না বা ফুরোবে না।

সংকলন ও অনুবাদ -নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

# ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

## মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

পর্ব ১ ঃ

**পঞ্চম অধ্যায়**

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

**গ্রীক দর্শন**

আমরা আবার ভলাসটসের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সক্রেটিসের ঈশ্বরভক্তি (Socratic piety) শিরোনামে একটি দীর্ঘ অধ্যায় লিখে ভলাসটস তার দৃষ্টিতে ঐশীবাণী এবং যুক্তির ব্যাপারে সক্রেটিসের চিন্তার অসঙ্গতি দূর করার প্রচেষ্টা নেন। সক্রেটিসকে দোষ মুক্ত করা ও তার ধর্ম -বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে বৈপরীত্য কমানোর লক্ষ্যে তিনি বলেন যে, ধর্ম সংক্রান্ত উক্তিগুলো আসলেই সক্রেটিসের কিনা সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। অথচ তার লেখাতেই সুস্পষ্টভাবে সক্রেটিসের ধর্ম-বিশ্বাস কি ছিল তা আমরা জানতে পারি। যেমন সক্রেটিসের উক্তি "আমি সব সময়ই আমার বিবেচনায় যে যুক্তি সর্বোৎকৃষ্ট তাকে গ্রহণ করেছি, এবং তার দ্বারা পরিচালিত হয়েছি। কিন্তু অতিন্দ্রীয় মাধ্যমে যেসব ঐশীবাণী আমি পাই, সেগুলোর নির্দেশও আমি মান্য করি।" এমন কি এথেন্সের আদালতের সমানে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও তিনি দ্ব্যর্থকণ্ঠে বলেছিলেন, "আমি এরূপ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আমি ঐশীবাণী, সত্য-স্বপ্ন এবং আরো বিভিন্ন উপায়ে ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি, যেভাবে অন্যেরাও এরূপ ঐশী-অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছেন।" এরূপ স্পষ্ট উক্তি থাকা সত্ত্বেও ভলাসটস তার বিবেচনায় সক্রেটিসের এ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাজনিত ধর্ম-বিশ্বাসের ত্রুটি থেকে তাকে অবমুক্ত করার লক্ষ্যে এক দীর্ঘ আলোচনা করেন। কিন্তু তার পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা সত্ত্বেও ভলাসটস তার ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে আমরা মনে করি। প্রসঙ্গক্রমে ভলাসটসের লেখা আবার এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও সক্রেটিস নির্ভীকভাবে এ উক্তি করেন, "আমি এরূপ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি- ঈশ্বর কর্তৃক-"। লক্ষ্যণীয় যে সক্রেটিস এক বচনে ঈশ্বর বা God এর কথা উল্লেখ করেছেন যে শব্দটি ইংরেজী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী প্রথম অক্ষর G বড় হাতের অক্ষরে লিখা উচিত ছিল। কিন্তু

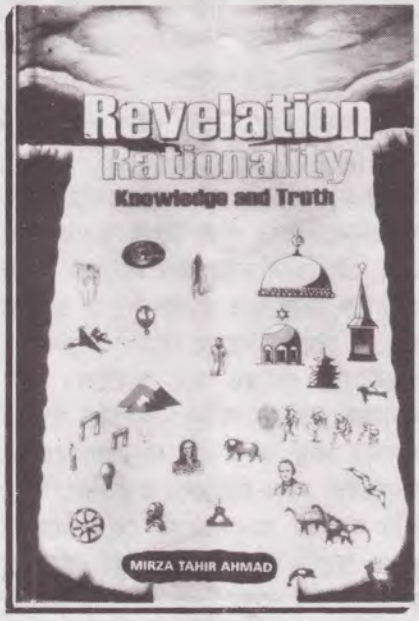


ভলাসটস ইচ্ছাকৃতভাবে g ছোট হাতের অক্ষরে লিখেছেন। তাছাড়া সক্রেটিসের ব্যক্তিগত ঐশী উপলব্ধির উল্লেখ ভলাটসের কাছে দ্ব্যর্থবোধক মনে হলেও এটা এতই শক্তিশালী ও যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রসূলদের অভিজ্ঞতা মূলে এমনই সার্বজনীন ও প্রমাণসিদ্ধ একটি বিষয় যে, একে অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই আসে না। কুরআনের অসংখ্য আয়াত সক্রেটিসের এ উক্তিকে সমর্থন করে, বিশেষভাবে যখন তিনি বলেন, তিনি ছাড়া অন্যারাও ওহী, সত্য-স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ইত্যাদির মাধ্যমে যুগে যুগে ঐশী-অনুগ্রহের অংশ প্রাপ্ত হয়েছেন। আসলে যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সক্রেটিসকে মূল্যায়ন করা উচিত ছিল তা ভলাসটস করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই সক্রেটিসের ওহী প্রাপ্তির কথা একদিকে, আবার তার বিবেচনায় যে যুক্তি সর্বোৎকৃষ্ট তাকে গ্রহণ করার কথা অন্যদিকে- এ দুটোর মধ্যে তিনি সমন্বয় করতে পারেন নি। তাই ভলাসটস প্রশ্ন তুলেছেন; আমরা কি করে এ কথা বিশ্বাস করবো যে, দুটো পরস্পর বিরোধী ও অসম বিষয়, অর্থাৎ একদিকে যুক্তি ও অন্যদিকে ঐশীবাণীর মাধ্যমে জ্ঞান ও সত্য অনুসন্ধানের কথা সক্রেটিস বলতে পারেন? শুধু যুক্তিকে মুক্তির একমাত্র পথ বিবেচনার ভ্রান্তিই ভলাসটসকে এ সংকটে ফেলে দিয়েছে।

আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি যে, খন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সক্রেটিসের বিশ্বাস ও কথার মধ্যে অনেক অসংগতি সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন, গ্রীক দেব-দেবীর অনেক সমালোচনা সক্রেটিসের কথা থেকে আমরা দেখি। তাদের কোন ঐশী ক্ষমতা নেই, বা যাজকের মাধ্যমে দৈববাণী প্রাপ্তির কথা নিতান্তই অমূলক- এসব কথাও সক্রেটিস থেকে উচ্চারিত। আবার অন্যদিকে তিনি তার নিজস্ব ওহী প্রাপ্তির অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করেন নি, বা এসব নিয়ে হাসি-ঠাট্টাও করেন নি। ঠিক তেমনি তিনি কোথাও ঈশ্বরকে (God) বলেছেন এক বচনে, কোথাও বহু বচনে (gods)। আসলে তিনি যখন আল্লাহ্ বা ঈশ্বরের সাথে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথা বলেছেন, তিনি তাঁর পরিচয় এক বচনে (God) প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, তিনি যখন প্রচলিত গ্রীক দেব-দেবী, অথবা সেই সমাজের কিছু কবির লেখা বা কাব্য প্রতিভার প্রশংসা করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখ করেছেন বহুবচনে (Gods)। সম্ভবত, এ কারণেই God এবং Gods সংক্রান্ত এ বিভেদ তৈরী হয়ে থাকবে।

এখানে একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। তদানীন্তন সমাজে সম্ভবত কিছু কাব্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়ে থাকবে, যাদের কোন কোন লেখা বা রচনাকে সক্রেটিস প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। তবে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এ ধরনের কবিতা বা রচনা কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না রাখায় এগুলোকে তিনি কোন মূল্য দেন নি। আরেকটি কথা, কবি এবং নবীদের মধ্যে পার্থক্য আছে। নবীরা খোদা থেকে প্রাপ্ত ওহীর ভিত্তিতে জ্ঞান ও সত্যের কথা বলেন। অন্যদিকে কবিরা নিজেদের কাব্যিক অনুপ্রেরণা ও সাময়িক কল্পনা শক্তির প্রয়োগে তাদের কাব্য রচনা করেন। সন্দেহ নাই, কোন কোন কবির রচনা এতটাই যাদুকরী মনে হতে পারে যে, খোদা যেন কবির উক্ত কথায় প্রকাশিত হচ্ছেন (god possessed)। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে তা কখনই খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। অন্যদিকে নবীরা আল্লাহ্‌র বাণীর (Revelation) আলোকে সৃষ্টিশীল কাজ করেন, সাময়িক কোন প্রেরণা (Inspiration) বা উদ্দীপনা দ্বারা কিছু করেন না। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র বিনয়ী বান্দা (humble servant) হিসাবে পরিচয় দেন। সমাজের কুসংস্কারে আবদ্ধ কোন কোন ব্যক্তির

বিশ্বাস অনুযায়ী অপ্রকৃতস্থ (god possessed) বা উন্মত্ত ব্যক্তির সাথে তাই নবীদের আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়ে থাকে।

ভলাসটসের বিবেচনায় সক্রেটিসের মধ্যে মাঝে মাঝে এক ধরনের অপ্রকৃতিস্থ (god possessed) হওয়ার প্রবণতা সক্রিয় ছিল। তাই তার আলোচনার উপসংহারে সক্রেটিসকে দোষমুক্ত করার অভিপ্রায়ে তিনি বলেছেন যে, সম্ভবত কোন অপ্রাকৃতিক শক্তি বা ঈশ্বরের প্রভাবে অন্যমনস্ক হয়ে মাঝে মাঝে সক্রেটিস তার সাথে উক্ত অতিমানবীয় সংযোগের কথা ব্যক্ত করেছেন, যা তার যুক্তিবাদিতার সাথে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ভলাসটসের এ অভিমতের বিপরীতে অন্যমত পোষণ করি এবং দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে, সক্রেটিসের ঐশী অভিজ্ঞতার দাবী সম্পূর্ণ সত্য। এটা কোন ব্যক্তির মানসিক ব্যাধি বা দুর্বলতাজনিত কারণে প্রকৃতিস্থ হয়ে বিলাপ করার কোন ঘটনা নয়। সক্রেটিসের বর্ণিত খোদা ও এথেন্সবাসীদের কল্পিত দেব-দেবী সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। আমরা এর সমর্থনে ভলাসটসের নিজ লেখা থেকেই উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, যা তিনি তার উক্ত উপসংহারের মাত্র ২ পৃষ্ঠা পরেই বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমরা আগেই বলেছি, তাদের (অর্থাৎ এথেন্সবাসীর) দেব-দেবী (gods) থেকে সক্রেটিসের খোদা (god) সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কারণ, সেই অস্তিত্ব শাশ্বত কল্যাণকামী, যিনি কখনো কোনভাবে কারোরই কোন ক্ষতি করেন না। সক্রেটিসের খোদা প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী নন।"

একই অধ্যায়ে ভলাটস সক্রেটিসের উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সেটি তথাকথিত এথেন্সবাসীর পদ্ধতির তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত বলে উল্লেখ করেন। তার মতে, "এথেন্সের দেব-দেবীরা মানুষের প্রদত্ত পূজার ফলমূল বা দক্ষিণার উপর নির্ভরশীল বলে মনে হয়। এটা যেন মানুষ এবং ঈশ্বরের মাঝে এক ধরনের ব্যবসায়িক লেদ-দেন। কিন্তু সক্রেটিসের খোদা এ ধরনের দান-দক্ষিণার উপর নির্ভরশীল নন।"

এথেন্সবাসীর দেব-দেবী (gods) এবং সক্রেটিসের খোদার (God) ব্যাখ্যায় আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সক্রেটিস বহুবচনে উক্ত দেব-দেবীর কথা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। তবে বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন কোন সময় তিনি (gods) দ্বারা ফিরিশ্‌তা বা অন্য কোন ধরনের আধ্যাত্মিক জীবন বা সাধারণ মানুষের অবস্থান থেকে উর্ধ্বে কিন্তু খোদার মর্যাদার নীচে, তাদের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। তবে খোদার সাথে তার ব্যক্তিগত সংযোগের কথা বুঝাতে গিয়ে তিনি সর্বদা একবচনেই এক খোদার কথা উল্লেখ করেছেন।

এবারে আমরা সক্রেটিসের ধর্মীয় রাজনৈতিক দর্শন (religio-political philosophy) ব্যাখ্যায় বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে একটি সার্বজনীন সত্যের কথা উল্লেখ করবো। তা হলো এই, কোন নবীই তার বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থাকে জোর করে বদলান নি, বা প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি। সক্রেটিসের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তিনি এথেন্সের প্রচলিত আইন -কানুনের অনুগত ছিলেন। কিন্তু যখন এই আনুগত্য খোদার আনুগত্যের সাথে বিরোধের জন্ম দিল, তখন তিনি আল্লাহ্‌র আনুগত্যকেই মেনে নিলেন। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ পরিত্যাগ করলেন। তাই অকুণ্ঠ চিত্তে এথেন্সের সিনেট, যা তাকে মৃত্যুদন্ডের রায় দিয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "এথেন্সের লোকজন, আমি তোমাদের সম্মান করি এবং ভালবাসি। কিন্তু আমাকে তোমাদের ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসার মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হচ্ছে এবং আমি আল্লাহ্‌কেই বেছে নিচ্ছি। এবং যতদিন আমার জীবন ও শক্তি আছে, এ আদর্শ থেকে আমি কখনো বিচ্যুত হবো না।" তাকে শর্ত সাপেক্ষে মৃত্যুদন্ড থেকে অব্যাহতি দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু সক্রেটিস তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। স্বীয় মত ও আদর্শে সক্রেটিস ছিলেন অবিচল। বিষয়টি নিয়ে আদালতে সক্রেটিস এবং মেলেটাস (Meletus), (যিনি ছিলেন এথেন্সের প্রধান সরকারী উকিল), উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথন চলতে থাকে। পরিশেষে, মেলেটাস এ কথার উপর জোর দেন যে, গ্রীক দেব-দেবীর প্রতি সক্রেটিসের প্রকাশ্য অস্বীকৃতি নাস্তিকতার নামান্তর। তাই এথেন্সের আইনে সক্রেটিসকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হলো।

কিন্তু আল্লাহ্‌র আইনকে অনুসরণ করার প্রতি অধিক যত্নশীল সক্রেটিস এথেন্সের আইন মেনে অন্যায়ের সাথে আপোস করতে চান নি। মৃত্যুর পরওয়ানাকে সামনে নিয়েও তিনি নির্ভীকভাবে এথেন্সেবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন; "তোমরা হয়ত ভাবছ তোমাদের এ রায় কার্যকর করে (অর্থাৎ আমাকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে) তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে কোন অপরাধ করছ না। কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, তোমরা যদি আমাকে হত্যা কর, আমার অনুরূপ আরেকজনকে তোমরা সহজে পাবে না" – । এরপর সক্রেটিস অত্যন্ত শান্ত ও অবিচলিত কণ্ঠে তার জীবন দর্শনের এমন কিছু যুক্তি পেশ করেন, যা চিরকাল তার মহত্বকে সমুন্নত করে রাখবে। তিনি যেসব কথা তখন বলেছিলেন Jowett এর লেখা থেকে উদ্ধৃত করলে তা অনেকটা এরূপ, "আমাকে যারা আজ অপরাধী সাব্যস্ত করছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উদ্ধত ব্যক্তিও কখনো একথা বলতে পারবে না যে, আমি কারো কাছ থেকে জোর করে কিছু গ্রহণ করেছি। এর কোন সাক্ষী তারা পেশ করতে পারবে না। বরং আমার দারিদ্রই আমার সত্যতার সাক্ষী। আমার অতীত কর্মকান্ডও এটাই প্রমাণ করে যে, নীতির প্রশ্নে আমি কখনোই ক্ষমতাসীনদের সাথে আপোস করিনি। দেখ, আমি মৃত্যুকে একটা খড়-কুটার মতও মনে করি না, এবং এ নিপীড়নকারী ক্ষমতাসীনদের ভয় কখনোই আমাকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করতে পারে না। আমার ভয় তো শুধু এজন্য যে, আমি কখনো যেন অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত না হই। পরিশেষে হে এথেন্সের জনগণ! তোমাদের কাছে এবং আমার আল্লাহ্‌র কাছেই আমি আমার দায়ভার তুলে দিলাম" (And to you and to God I commit my cause)।

যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অকুতোভয় তা নিয়ে সক্রেটিস তার জীবন সায়াহ্নে উপরোক্ত কথা বলেছিলেন তার দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। বস্তুততার সামগ্রিক জীবন ও আদর্শ বিশ্লেষণ করলে যে চরিত্র আমরা পাই তা কুরআন ও অন্য ঐশীগ্রন্থে চিত্রিত নবী-রসূলের হুবহু অনুরূপ। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এক আল্লাহ্‌র (God) উপর ছিল তাঁর সন্দেহাতীত বিশ্বাস। তবে তার উক্তিতে যে সব ক্ষেত্রে (Gods)-এর উল্লেখ রয়েছে, তা সকল ক্ষেত্রেই গ্রীক দেব-দেবীকে বুঝায় নি, বরং ঐশী পুস্তকাদিতে যে অর্থে ফিরিশ্‌তা বা দেবদূতদেরকে বুঝিয়েছে, সে অর্থেও উচ্চারিত হয়েছে।

এবারে সক্রেটিসের হেমলক পান নিয়ে কিছু কথা। ফীডোর প্রান্তরে আত্মহত্যার বিপক্ষে তিনি জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন বলে জানা যায়। ইসলামের শিক্ষার মতই সক্রেটিস বলতেন, মানুষ নিজ থেকে তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি এটা আল্লাহ্‌র হুকুম হিসাবে (অর্থাৎ সমস্ত কিছুর

পরিণতি যেহেতু আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই হয়, তাই আদালতের সমনকেও তিনি আল্লাহ্‌র সমন বলে উল্লেখ করেন) আসে, তখন তো তাকে মেনে নিতেই হবে। (A man should wait, and not take his own life until God summons him, as he is now summoning me).

যাই হোক, সক্রেটিস হেমলক পান করার পরও তার বক্তৃতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় যে লোকটি হেমলক তার পিয়ালায় ঢেলে দিয়েছিল সে তাকে তার বক্তৃতা বন্ধ করতে বললো। কেননা, তা না হলে উক্ত হেমলকের বিষক্রিয়া ঠিক ভাবে কাজ করবে না এবং তাকে দু'তিন বার সেটা পান করাতে হবে। সক্রেটিস তার কথায় খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, "যে যার কাজ করুক, এবং প্রয়োজন হলে সে তাকে দু'তিন বারই বিষ ঢেলে দিবে।"(Let him mind his business, and be prepared to give the poison two or three times)। এভাবে যতক্ষণ না তিনি হেমলকের প্রভাবে একদম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার বক্তৃতা চালিয়ে যান। শুভাকাঙ্খীদের উদ্দেশ্য তিনি বললেন, "শুভার্থীরা আমার, প্রফুল্ল হও। তোমাদের এ বন্ধু, যে একজন খাঁটি দার্শনিকের মতই তার জীবন কাটিয়েছে, তার আনন্দিত হওয়ার সময় সমাগত। মৃত্যুর পর তার হয়ত অন্য জগতে সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ ও আনন্দের উপকরণ মিলে যাবে" (after death, he may hope to receive the greatest good in the other world)।

এভাবেই খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর একজন মহান নবী, হযরত সক্রেটিস (আঃ)-এর জীবনের অবসান ঘটে। তিনি ছিলেন আরেক জন আল্লাহ্‌র নবী হযরত বুদ্ধ (আঃ)-এর সম-সাময়িক। তাছাড়া বুদ্ধের সাথে তার অনেক বিষয়ে কিছুটা সাদৃশ্যও ছিল। যেমন, বুদ্ধের মত সক্রেটিসের বাণীও তার জীবদ্দশায় লিখিত আকারে ছিল না। পরবর্তীতে বুদ্ধের বাণী যেমন ত্রিপিটকের মাধ্যমে লিখিত হয়েছে, সক্রেটিসের বাণীও ডায়ালগ্‌স (Dialogues) এর মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছিল। গ্রীকের বহু দেব-দেবীকে অস্বীকার করার কারণে সক্রেটিসকে যেমন নাস্তিকতার দন্ডে দন্ডিত হতে হয়, বুদ্ধকেও সেভাবে ব্রাহ্মণদের বহু ঈশ্বরকে অস্বীকার করার জন্য নাস্তিকতার অপবাদ সহ্য করতে হয়েছিল। একথা অনস্বীকার্য যে, মানব ইতিহাসের যে কল্যাণ সক্রেটিস তার দর্শনের মাধ্যমে করে গেছেন, তা তাকে চির-স্মরণীয় করে রাখবে। Chambers Encyclopaedia তার সৃষ্টিশীল চিন্তা ও কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাই এভাবে তুলে ধরেছে; "দর্শনকে সক্রেটিস আকাশ বা স্বর্গ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে টেনে এনেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে সুখ-সম্ভোগ, এমনকি সামান্য আরাম-আয়েশও তিনি ভোগ করেন নি। সক্রেটিসের ঐশীবাণী প্রাপ্তি সম্পর্কে বলা হয় যে একটি অতিন্দ্রীয় শক্তি থেকে তিনি নির্দেশিত হতেন। পরবর্তী যুগের লেখকরা তার এই অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কারো কারো মতে এটা ছিল সেবক আত্মার (attendant spirit) প্রভাব, কেউ এটাকে এক ধরনের অলীক শ্রবণ (hallucinations of hearing) বলেছেন, যা অনেক সুস্থ লোকের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে। আবার কেউ সক্রেটিসের দর্শনে দেখেছেন আপাত বিরোধিতা।"

প্রকৃত প্রস্তাবে, সক্রেটিসের দর্শনে কোন আপাত বিরোধিতা ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্যই এ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে, সক্রেটিসকে বাঁচাবার জন্যই মনে হয় তাদের কেউ কেউ তার মানসিক অভিজ্ঞতা বা সম্মোহনীর একটা ভদ্র জনোচিত ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। তা হলো এই যে, এগুলো মানসিক রোগীদের মত পাগলামী ছিল না, বরং সুস্থ লোকেরও একরম অভিজ্ঞতা হতে পারে। দুর্ভাগ্য, সক্রেটিসকে তো তারা বিশ্বাস করেন, কিন্তু সক্রেটিস যে খোদা ও ঐশী বাণীর প্রতি তাঁর বিশ্বাসের কথা বলেছেন, তার প্রতি তাদের কোন আস্থা নেই। তাদের মতে, সেটা ছিলো এক ধরনের মানসিক বিকার মাত্র।

এ বিষয়ে বিতর্ককে আর না বাড়িয়ে আমরা বলতে চাই যে, এটা শুধু সক্রেটিসের বেলায়ই ঘটে নি, সকল নবীর ক্ষেত্রেই হয়েছে। নবী-রসূলদেরকে সকল সমাজই উম্মাদ বা পাগল আখ্যা দিয়েছে। অথচ তারা ছিলেন তখনকার বিরাজমান সমাজের সবচেয়ে মহৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, শিশুকাল থেকে পূর্ণ বয়স প্রাপ্তি পর্যন্ত তারা ছিলেন সে সমাজে সকলের সম্মানিত। অথচ যখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবুওয়তের দাবী ঘোষণা করা হলো, সবাইকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান জানানো হলো, তখনই তাদেরকে পাগল ও মানসিক বিকারগ্রস্থ লোক বলে বৃহত্তর সমাজ ও সমাজপতিরা অভিহিত করলো।

একটা বিষয় এখানে গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার। যাদেরকে নবুওয়ত পরবর্তী পর্যায়ে অলীক শ্রবণ বা মায়ার ভ্রমে বিকারগ্রস্থ রোগী ভাবা হয়, তারা কিন্তু সবাই সুস্থ দেহের অধিকারী ছিলেন এবং এ ধরনের রোগের কোন লক্ষণ তাদের ইতিপূর্বে ছিল না। বরং সবাই সুস্থ দেহ ও নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহলে হঠাৎ করে তাদের এই মনোবৈকল্য লক্ষ্য করার কি কারণ থাকতে পারে? আসলে এটা নবীদের মনোবৈকল্য নয়, বরং যারা নবী-রাসূল, খোদার অস্তিত্ব, ঐশীবাণী ইত্যাদির অস্বীকারকারী, তাদের এক ধরনের মানসিক বিকার যাতে এ কথা বলে তারা ঐশীবাণীর অমর্যাদা করতে পারে। এটা কি কখনো সম্ভব যে, মানসিক বিকারগ্রস্থ বা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত কোন রোগীর প্রলাপ থেকে কোন নৈতিকতাসম্পন্ন জীবন বিধানের সন্ধান মেলে? যেসব বিলাপ বা সংলাপ তারা বলে তা সময়ের বাধাকে অতিক্রম করে দীর্ঘদিন পরও মানুষের আত্মাকে সমৃদ্ধ করে? অথবা তার উপর ভিত্তি করে কোন নুতন বিষয়কে উপলব্ধি বা যুগোপযোগী করা যায়? তারা তাদের নিজেদের জীবনে সঞ্চিত কোন ঘটনা থেকে এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে ভাল হতো।

আমরা শুধু বলতে চাই, মানসিক বিকারগ্রস্থতা যদি সক্রেটিসের উপর আরোপ করা হয়, তাহলে মানুষের জ্ঞান ও পুণ্য অর্জনের ব্যাপারে, জাতির অন্তরে জাগরণ সৃষ্টি ও অন্যায় প্রতিরোধের ব্যাপারে তার যে অমূল্য শিক্ষা ও দর্শন আমরা পেয়েছি, তার সবটুকুকেই অস্বীকার করতে হয়। কেননা, বিকারগ্রস্থতার পরিণতিতে এসব কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং ঐশীবাণীর আলোকেই তিনি এসব কথা বলেছিলেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা খন্ডিত সক্রেটিসে বিশ্বাস করি না, তাই ঐশী বাণীর প্রতি তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

এ রকম একজন চিরায়ত ব্যক্তিত্ব, যাঁর জন্মের সময়ও ছিল শান্তি, সারা জীবন যিনি শান্তির অন্বেষায় কাটিয়েছেন। জনতার ভীড়ে দাঁড়িয়ে যখন তার শুভার্থীরা তার কক্ষ থেকে বিলাপ করে কাঁদছিলেন, তখনো মৃত্যুকে যিনি অবলীলায় গ্রহণ করেছেন শান্ত ও স্মিতমুখে। আমরা তাঁর আত্মার প্রতি সালাম জানাই।

আমরা দোয়া করি, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁর দয়া ও করুণার অজস্র বারিধারা তাঁর প্রতি বর্ষণ করুন। কিন্তু তার হত্যাকারীদের প্রতি শোক ও অনুতাপ। এথেন্স তার মতো মহৎ ব্যক্তির সাক্ষাৎ আর কখনো পাবে না। (চলবে)

অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন

# মুনাজাতে রসূল (সঃ)

## [রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(২৪তম কিস্তি)

### সোজা রাস্তায় চলার দোয়া

♦ হযরত আলী (রাঃ)-কে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ দোয়া শিখান আর বলেন, এ দোয়া পড়তে পড়তে হেদায়াত অর্থ সোজা রাস্তা এবং 'রাহে সাদীদ' অর্থ তীরের মত সোজা রাস্তা মনে করে নাও ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ وَ سَدِّدْنِیْ . (مسلم کتاب الذکر)

(আল্লাহুম্মাহ্ দিনী ওয়া সাদ্দিদনী - মুসলিম কিতাবুয্ যিক্‌র)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে সঠিক পথ দেখাও এবং পরে সোজা-সরল পথে প্রতিষ্ঠিত করে দাও।

### দৃঢ় মনের জন্যে দোয়া

♦ হযরত শাহ্‌র বিন খুশাব হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) থেকে হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অধিক সংখ্যায় পাঠ করা দোয়া সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি এ দোয়ার কথা বলেন। হযরত উম্মে সালামাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, হুযূর (সঃ) আপনি এ দোয়া বেশি বেশি পাঠ করেন কেন? তখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর খোদার ঐ আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে। তিনি যখন চান সেটাকে বদলে দেন।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِیْ عَلٰی دِیْنِكَ -

(ترمذی کتاب الدعوات)

(ইয়্যা মুক্বাল্লিবাল কুলূবি সাব্বিত ক্বলবী আলা দীনিকা- তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

### খোদাতাআলার ওপরে পরিপূর্ণ ভরসার দোয়া

♦ হযরত ইবেন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ এ দোয়াটি পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ ،وَبِكَ آمَنْتُ ،وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ،وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ ،وَبِكَ خَاصَمْتُ ،اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ ،لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ،اَنْ تُضِلَّنِیْ ،اَنْتَ الْحَیُّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ ،وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ یَمُوْتُوْنَ- (مسلم کتاب الذکر)

(আল্লাহুম্মা লাকা আস্‌সালামতু ওয়া বিকা আমানুত-ওয়া 'আলায়কা তাওয়াক্কালতু-ওয়া ইলায়কা আনাবতু-ওয়া বিকা খাসামতু - আল্লাহুম্মা আ'উযু বি'ইয্‌যাতিকা-লা ইলাহা ইল্লা আনতা-আন তুযিল্লানী-আনতাল হায়্যুল্লাযী লা ইয়ামূতু-ওয়াল জিন্ন ওয়াল ইনসু ইয়ামূতুনা - মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি আমার সব কিছু তোমার সোপর্দ করে দিয়েছি। এবং তোমার ওপরে ঈমান এনেছি। এবং তোমার ওপর ভরসা করেছি। আর তোমার প্রতি ঝুঁকেছি। তোমার নাম নিয়েই আমি শত্রুর মোকাবেলা করছি। হে আল্লাহ্! আমি তোমার সম্মানের আশ্রয় চাচ্ছি, তোমার সম্মানের আশ্রয় যিনি ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করবে না। তুমিই সেই জীবিত সত্তা যাঁর ওপরে কখনও ধ্বংস আসবে না অথচ সমস্ত মানুষ ও জিন্ন পরিশেষে মারা যাবে।

### দীন ও দুনিয়ার সংশোধনের দোয়া

♦ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রসূলে করীম (সঃ)-এর এ দোয়া বর্ণনা করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِیْ دِیْنِیَ الَّذِیْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِیْ وَ اَصْلِحْ لِیْ دُنْیَایَ الَّتِیْ فِیْهَا مَعَاشِیْ ،وَاَصْلِحْ لِیْ آخِرَتِیَ الَّتِیْ فِیْهَا مَعَادِیْ ،وَاجْعَلِ الْحَیَاةَ زِیَادَةً لِّیْ فِیْ كُلِّ خَیْرٍ ،وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّیْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ-

(مسلم کتاب الذکر)

(আল্লাহুম্মা আসলিহ্ লী দীনীল্লাযী হুয়া 'ইসমাতু আমরী ওয়া আসলিহ্ লী দুনয়ায়াল্লাতী ফীহা মা'আশী-ওয়া আসলিহ্ লী আখিরাতিয়াল্লাতী ফীহা মা'আদী ওয়াজআলিল হায়াতা যিয়াদাতাল্লী ফী কুল্লি খয়ের-ওয়াজ'আলিন মাওতা রাহাতাল্লী মিন কুল্লি শার্‌রি - মুসলিম কিতাবুয্ যিক্‌র)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার জন্যে আমার এ ধর্মকে সংশোধন করে দাও, যা আমার ব্যাপারটি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার মাধ্যম সাব্যস্ত হয়। আর আমাকে এ দুনিয়ার ও সংশোধন করে দাও যা আমার আরামের মাধ্যম সাব্যস্ত হয়। এবং সে আখিরাতেরও সংশোধন করে দাও যা আমার পরিণামের উপকরণ রয়েছে ও আমার জীবনের প্রত্যেক দিক থেকে মঙ্গল বাড়িয়ে দাও আর আমার মৃত্যুকে প্রত্যেক প্রকারের অমঙ্গলের পথ থেকে মুক্তির মাধ্যম করে দাও।

### দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ ও স্বস্তির একটি উত্তম দোয়া

♦ হযরত আনাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট উত্তম দোয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। একাদিক্রমে ৩দিন পর্যন্ত হুযূর (সঃ) এই প্রশ্নের জবাবে একই দোয়া শিখাচ্ছিলেন। আর বল্লেন, দুনিয়া ও আখিরাতে স্বস্তি লাভ হলে বড় সফলতার এ দোয়াই রসূলে করীম (সঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে শিখিয়েছেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে এ দোয়া শিখাতে গিয়ে বল্লেন, ঈমান নিয়ে আসার পরে স্বস্তি লাভের চেয়ে আর কোন মঙ্গল নেই।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ

(ابن ماجہ کتاب الدعاء)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌য়ালুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আফিয়্যাতা ফিদ্দুনয়া ওয়াল আখিরাতি - ইবনে মাজাহ্, কিতাবুদ্, দোয়া)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্। আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও সুস্থতা কামনা করি।

### ঐশী সুরক্ষা লাভের দোয়া

♦ বনী হাশেমের মুক্তি-প্রাপ্ত দাস আব্দুল হামীদ তার মা [যিনি নবী করীম (সঃ)-এর এক কন্যার খাদেমা ছিলেন) থেকে বর্ণনা করতেন যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যাকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌তাআলার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্যে এ দোয়া শিখিয়েছেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ یَشَأْ لَمْ یَكُنْ ،اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا-

(ابوداؤد کتاب الادب)

(সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী লা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি মাশায়াল্লাহু কানা ওয়ামালাম

**ইয়াশা'লাম ইয়াকুন- আলা'মু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শায়ইন ক্বদীর ওয়া আন্নাল্লাহা ক্বদ আহাত্বা বিকুল্লি শায়ইন 'ইলমান** - আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব)।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র। আল্লাহ্ ছাড়া কারও কোন শক্তি সামর্থ্য লাভ হয় না। যা আল্লাহ্ চান তা হয় আর যা আল্লাহ্ চান না তা হয় না। আমি জানি যে, আল্লাহ্ সব বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান। আর জ্ঞানের দিক থেকে তিনি সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

## খোদা-ভীরুতা ও আত্ম-শুদ্ধি লাভের দোয়া

♦ হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন আরকাম নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ দোয়া বর্ণনা করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِیْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا۔ (نسائی کتاب الاستعاذہ)

**(আল্লাহুম্মা আতি নাফসী তাক্ওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আনতা খয়রু মান যাক্কাহা- আন্তা ওয়ালীয়্যুহা ওয়া মাওলাহা** - (নিসাঈ, কিতাবুল ইসতি'আযাহ্)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার প্রাণে তাক্ওয়া ও খোদা-ভীরুতা দান কর আর তাকে পবিত্র করে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী। তুমিই তার বন্ধু ও প্রভু। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

# বেশি নিবিড় ও গভীরভাবে উপলব্ধি

'ইসলামি নীতি-দর্শন' বইটি কতবার পড়েছি স্মরণ নেই। যতবার পড়েছি মনে হয়েছে এই প্রথম পড়ছি। আমার দুই প্রফেসরকে বইটি দিয়েছি তাঁরা শুধু মন্তব্যতেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি, নিজের জীবনের জন্যও গুরুত্ববহ ব্যবস্থা নিয়েছেন। ১৯৩৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকাস্থ জগন্নাথ কলেজে আই এস সি পড়তে ভর্তি হই। প্রফেসার রাজ বিহারী বোস পদার্থ বিজ্ঞান পড়াতেন। ক্লাসে এসেই তিনি ছাত্রদের লক্ষ্য করে মানুষের নৈতিক গুণের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতেন। তাঁকে আমি এ বইটি উপহার দিই। ৭/৮ দিন পর তিনি ক্লাসে বল্লেন- এ ক্লাসের ছাত্র মোস্তফা আলী আমাকে 'The Philosophy of the Teachings of Islam' পুস্তকটি দিয়েছে। আমি বইটি পড়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, প্রত্যহ ভোরে গীতা পাঠের পর এ বইটি পড়বো। একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু প্রফেসরের কাছ থেকে এর শ্রদ্ধা দেখানোর সুন্দর পথ আর কী হতে পারে!

১৯৫৮ সালে সরকারী কর্মচারী হিসেবে ট্রেনিংয়ের জন্য আমেরিকায় যাই। প্রফেসর ডাঃ রাসেল পড়াতে এসে প্রথম ৩/৪ মিনিট নৈতিকতা সম্পর্কে বলতেন এবং তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য চাইতেন। আমি তাকেও উপরোক্ত বইটি দিই। তিনিও ৭/৮ দিন পর ক্লাসে বল্লেন মিঃ আলী আমাকে একটি বই দিয়েছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, রোজ ভোরে বাইবেল পড়ার পর এই বইটিও পড়বো। তিনি আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেন আমি তাঁকে ১৭ কপি বই দিতে পারবো কিনা। আমি ৫/৭ দিন সময় চাই এবং ওয়াশিংটনে আমাদের মিশনকে (আহমদীয়া মুসলিম জামাত) বিস্তারিত জানিয়ে পত্র লিখি। আমি বই পেয়ে যাই। যথা সত্তর প্রফেসর রাসলকে জানাই। টেক্সাসের যে এলাকায় আমরা থাকতাম সেখানে খৃষ্টানদের ১৭টি সেক্ট ছিল। তাদের একটি সংস্থা ছিলো যার হেড ছিলেন প্রফেসর রাসেল। তিনি একটি টি পার্টির আয়োজন করেন যার প্রধান অতিথি করা হয় ইসলামের এ নগণ্য খাদেমকে।

বইটি নিয়ে খুবই উচ্চাংগের ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা হয়। সবাই বইটির বহুল প্রচারের কামনা করেন।

- **মোহাম্মদ মোস্তফা আলী**

# অমর যাঁর জীবন কথা

সাহেবযাদা মির্যা মুযাফ্ফর আহমদ সাহেবকে সর্ব প্রথম দেখিছি ১৯৬৩ সালের গ্রীষ্মের এক প্রখর দিনে, যখন তাঁর বুযূর্গ পিতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ছেলে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের জানাযায় সামেল হবার জন্য তিনি রাবওয়া আসেন। মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের সাথে মোলাকাতের সুযোগ পেয়েছি। তবে মসজিদে মোবারকে নামায মাগরেব আদায়ের জন্য নামাযের আগেই যখন সেখানে এসে চলাফেরা করতেন, তখন অনেক ছেলেপেলে তাঁর সাথে সাথে Walk -এ যোগ দিয়ে তাঁর কথায় উপকৃত হতো।

মির্যা মুযাফ্ফর আহমদ সাহেবের রাজনীতির কোন আলোচনা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয়। দু'টি বিষয়ে পাঠককে অবহিত করছি। ১৯৮৭ সালে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসাবে আমেরিকা সফরে গিয়েছিলাম। তখন তাঁর ঘরে কয়েকদিন থাকার সুযোগ হয়। তিনি তখন বিশ্ব ব্যাংকের কাজে ব্যস্ত। আমিও খোদ্দামের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বেশি সময় তাঁর সাথে বসার সময় পাই নি। তবে এ কথা ভুলার নয় যে, তিনি বলেছিলেন, অন্তত একবার যেন প্রত্যহ তাঁর সাথে দেখা করি। বিশেষ করে খাবার বা চা পানের সময় যদি সুযোগ হয় তবে তিনি বেশি খুশী হবেন। এ আন্তরিকতা এবং স্নেহের কথা আমার মনে জেগে আছে। তাঁর সেই স্নেহ-মমতার মূল্যায়ন করার জ্ঞান তখন হয় নি, তবে এখন তার কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করার বয়স হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

তাঁর সাথে শেষ দেখা হয় ১৯৯৭ সালের লন্ডন জলসায়। সেই জলসায় মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব, নাযের আলা ও সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়াও জলসায় এসেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর সাথে সফরে যাবার জন্য মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি আগেই যাত্রা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কারণ তিনি দ্রুত Driving পসন্দ করতেন না। অপর দিকে হুযূর দ্রুত Driving পসন্দ করেন। আমি সেই সময় হযরত মির্যা মনসুর আহমদ সাহেবের সাথে একই ঘরে থাকার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর যাত্রার কিছুক্ষণ আগেই এম এম আহমদ সাহেব এসে হাজির। তখন অবশ্যই তিনি সুস্থ ছিলেন না। তবুও মির্যা মনসুর আহমদ সফরে যাবেন তাই দোয়া করে বিদায় দিবার জন্য তিনি হাজির হয়েছিলেন। তবে দোয়া কে করাবেন? একজন বুযূর্গ আরেক জনকে অনুরোধ করছেন। শেষে এম এম আহমদ সাহেবের বিশেষ অনুরোধে মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব দোয়া করিয়েছিলেন। ঘটনাটি মূল্যায়ন করলে অনেকে হয়তো অবশ্য কিছুটা শিক্ষা লাভে সক্ষম হবেন। সেই দুই বুযূর্গদের সাথে সেটাই আমার শেষ দেখা। এম এম আহমদ সাহেব আমেরিকা এবং মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব রাবওয়া চলে যান। আমি অস্ট্রেলিয়া ফিরে আসি। আজ তাঁরা ইহলোকে নেই। তাঁদের স্মৃতি জেগে আছে।

- **মাওলানা মাহমুদ আহমদ**
আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, অষ্ট্রেলিয়া

# প্রসঙ্গ ঃ রোযা

(তৃতীয় ও শেষ কিস্তি)

## ফিদিয়া সম্বন্ধে কুরআনী নির্দেশ ঃ

**ওয়া আলাল্লাযীনা ইউত্বীকুনাহূ ফিদইয়াতুন ত্বআমু মিসকীন**- অর্থাৎ, আর যাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, তাদের ওপর ফিদিয়া - এক মিসকিনকে খাবার দান করা (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১৮৫ আয়াতাংশ)।

**কারা ফিদিয়া দিবেন ঃ**

যদি কোন লোক রোগাক্রান্ত হয়, হোক না তা সাময়িক বা এমন অবস্থায় যাতে রোযা রাখলে নিশ্চিৎভাবে সে রোগীতে পরিণত হবে; যেমন গর্ভবতী বা দুগ্ধবতী মহিলা, বা এমন বৃদ্ধ যার শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে বা যার শক্তিনিচয় পুরোপুরি বিকশিত হয় নি এসব ব্যক্তির রোযা রাখা উচিত নয়। আর এসব লোকের যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে তাদের ফিদিয়া দিতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেক রোযার জন্যে এক দরিদ্র ব্যক্তিকে খাবার দিতে হবে। যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির নিয়্যত আল্লাহ্তাআলা ভাল জানেন।

প্রতিবন্ধকতা সাময়িক হলে এবং তা দূর হলে ফিদিয়া দেয়া হোক বা না হোক পরে রোযা অবশ্যই রাখতে হবে। কেননা, ফিদিয়া দিয়ে দেয়াতে রোযা নিজ সত্তায় অকেজো হয়ে যায় নি বরং এটা তো কেবল এর বদলা যে, এ দিনগুলোতে অন্যান্য মুসলমানের সাথে মিলে এ ইবাদত পালন করা সম্ভব হয় নি। অথবা এর শুকরিয়া আদায়স্বরূপ যে, আল্লাহ্তাআলা আমাকে এ ইবাদত করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। কেননা, রোযা রেখে যে ব্যক্তি ফিদিয়া দেয় সে অধিক পুণ্যের অধিকারী হয়ে থাকে। রোযা রাখার সৌভাগ্য পেয়ে খোদাতাআলার শুকরিয়া আদায় করে আর যে রোযা রাখতে অপারগ হয় সে নিজের অপারগতার কারণে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ফিদিয়া দেয়।

এ অপারগতা দু'প্রকারের হয়ে থাকে। একটি সাময়িক অপরটি স্থায়ী। উভয় অবস্থাতেই ফিদিয়া দেয়া আবশ্যক। যখন অপারগতা দূর হয়ে যায় তখন রোযা রাখা জরুরী। মোটকথা যদি কেউ ফিদিয়াও দেয় কিন্তু ২/৩ বছর পরে যখনই শরীর অনুমতি দেয় তার সামর্থ্যানুযায়ী রোযা রাখতে হবে। কেবল এটা ছাড়া যে, প্রথমে রোগ সাময়িক ছিলো সুস্থ হওয়ার পরে সে আকাঙ্ক্ষা করে যে, আজ রাখবো বা কাল রাখবো এভাবে পুনরায় রোগ স্থায়ী হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার জন্যে ফিদিয়া যথেষ্ট হবে। (আল্ ফযল, ১০ আগষ্ট, ১৯৪০)।

সাধারণ নির্দেশ এই, মানুষ যেন রোযাও রাখে আর সামর্থ্যানুযায়ী ফিদিয়াও দেয়। তখন রোযা রাখা ফরয ও ফিদিয়া আদায় করা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত হবে। অবশিষ্ট রোযার জন্যে ফিদিয়া আদায় করা ঐ ব্যক্তির জন্যে জরুরী নয় যারা নিশ্চিৎভাবে রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণে কয়েকটি রোযা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কেবল মাত্র এ ক্ষেত্রে যে, সে এসব রোযার কাযা করার পূর্বেই নিজের প্রভুর পানে চলে যায়। এ অবস্থায় তার ওয়ারীসগণের ওপরে তার পক্ষ থেকে ফিদিয়া আদায় করা অবশ্য-কর্তব্য বা ততটা রোযা রেখে নেয়া কর্তব্য যা তার থেকে গিয়েছিলো।

রমযানের রোযার ফিদিয়া আদায় তাদের জন্যে অবশ্য-কর্তব্য যারা সামর্থ্যবান কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাদের কাযা রোযা রাখার সম্ভাবনা নেই যেমন, বৃদ্ধ, দুর্বল বা কোন চিররুগী বা গর্ভবতী এবং স্তন্যদায়িণী।

**ফিদিয়া রোযা রাখার সৌভাগ্য এনে দিতে পারে ঃ**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"একবার আমার মনে এলো, এ ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হয়েছে। তখন জানতে পারলাম, এজন্যে যে, এতদ্দ্বারা রোযার সৌভাগ্য লাভ হয়। আর প্রত্যেক বিষয় খোদার নিকটেই চাওয়া উচিত। তিনি একক সর্বশক্তিমান। তিনি যদি চান এক যক্ষা রোগীকেও রোযা রাখার শক্তি দিতে পারেন। এজন্যে যখন মানুষ দেখে যে, সে রোযা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে তখন তার দোয়া করা সমীচীন ঃ হে আল্লাহ্! তোমার এক পবিত্র মাস এসেছে। আমি এথেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি আর কে জানে আগামী বছর বাঁচি না মারা যাই বা এ ভাঙ্গতি রোযাগুলো আদায় করতে পারি কি না পারি, এজন্যে সৌভাগ্য প্রার্থনা করলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্তাআলা সামর্থ্য দিবেন" (ফাতাওয়া আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ১৭৫)।

**ফিদিয়ার পরিমাণ ঃ**

**মিন আওসাতি মা তুত্বইমূনা আহ্লিকুম** অর্থাৎ মধ্যম শ্রেণীর খাবার যা তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে খাইয়ে থাকো (সূরাতুল মায়েদা ঃ ৯০)।

অতএব এ নীতির প্রতি দৃষ্টি রেখে ফিদিয়া আদায় করতে হবে। যদিও ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ)-এর পরিমাণ গমের বেলায় অর্ধেক সা' (এক প্রকার মাপ) অর্থাৎ পৌণে দু'সের এর কাছাকাছি বর্ণনা করেছেন। আর এটাই হবে একটি ভাঙ্গতি রোযার ফিদিয়া। ইহা দু'বেলা খাবার জন্যে যথেষ্ট।

ফিদিয়া কোন রোযাদার গরীবকেই দেয়া জরুরী নয়। আসল উদ্দেশ্য প্রকৃত অভাবীকে খাবার খাওয়ানো। সে রোযা রাখতে পারুক বা কোন অসুবিধার কারণে রোযা রাখতে না পারুক। এভাবে ফিদিয়া তার জন্যে বিধেয় যার তা আদায় করার সামর্থ্য রয়েছে। একজন অসমর্থ ব্যক্তির জন্যে বিনয়, তওবা, ইস্তিগফার, দোয়া, যিক্রে ইলাহী ও ধর্মের সেবা করা যথেষ্ট।

**ই'তিকাফ ঃ**

ই'তিকাফ-এর অভিধানিক অর্থ কোন স্থানে আবদ্ধ হয়ে থাকা বা অবস্থান করা। ইসলামী পরিভাষায় ইবাদত বন্দেগীর উদ্দেশ্যে রোযা রেখে মসজিদে অবস্থান করার নাম **ই'তিকাফ**।

রোযার ন্যায় ই'তিকাফের ব্যবস্থা ও অন্যান্য ধর্মে পাওয়া যায় (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১২৬ ও সূরাতু মারইয়াম ঃ ১৭-১৮)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে পার্থিব কাজ-কর্ম থেকে পৃথক হয়ে হেরা গুহায় খোদাতাআলার ধ্যানে মগ্ন হওয়াও এক ধরনের ই'তিকাফ ছিলো। মানুষ যখন চায় যে দিন চায় ই'তিকাফ করতে পারে। কিন্তু রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফে বসা সুন্নত কর্তৃক সমর্থিত।

ই'তিকাফ সম্বন্ধে আল্ কুরআনের সূরাতুল বাকারাহ্র ১৮৮ আয়াতে উল্লেখ এসেছে।

তাছাড়া নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ই'তিকাফ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজের মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে আমল করে গেছেন যে, তিনি রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফে বসতেন। তাঁর (সঃ) মৃত্যুর পরে তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণও এ সুন্নতের অনুসরণ করতেন (মুত্তাফাকুন আলায়হে)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম লায়লাতুল কদরের অন্বেষণকারীদেরকে রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফে বসার নির্দেশনা দিতেন (মুসলিম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৪)।

২০শে রমযান ফজরের নামাযের পর হুযূর (সঃ) ই'তিকাফে বসতেন। ই'তিকাফের জন্যে কোন নির্ধারিত সংখ্যক দিন নেই। এটা ই'তিকাফকারীর ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে। যতদিন দিন চায় বসতে পারে। তবে হুযূর (সঃ)-এর সুন্নত মোতাবেক ১০ দিন সাব্যস্ত হয়। যে বছর তিনি (সঃ) ইন্তিকাল করেন সে বছর তিনি ২০ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন।

ই'তিকাফ ২০শে রমযানের ফজরের নামাযের পর থেকে শুরু করা উচিত। কেননা, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ১০ দিন ই'তিকাফ করতেন। আর ১০ দিন কেবল তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন ২০শে রমযান সকাল বেলা ই'তিকাফে বসা হয়।

ই'তিকাফের জন্যে উপযুক্ত স্থান হলো জামে' মসজিদ, যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে- ওয়া **আনতুম আকিফূনা ফিল মাসাজিদ** (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১৮৮)। অর্থাৎ যখন তোমরা মসজিদে ই'তিকাফে অবস্থান কর। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন- লা ই'তিকাফ ইল্লা ফী মাসজিদিন জামি'ইন অর্থাৎ জামে মসজিদে ছাড়া ই'তিকাফ নেই (আবূ দাউদ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৫)।

কোন স্থানে একাকী একজন আহমদী থাকলে বা মসজিদ না থাকার কারণে কয়েকজন আহমদী কোন ঘরে নামায পড়লে এমতাবস্থায় ঐ ঘরে যেখানে নামাযের জন্যে স্থান নির্ধারিত করা হয়েছে, ই'তিকাফে বসা যায়। বাধ্যবাধকতার কথা তো আল্লাহ্ ভাল জানেন। আর নিয়্যতের ওপরেই তিনি পুণ্য দিয়ে থাকেন।

যদি কোন স্থানে মসজিদ না থাকে বা মসজিদে মহিলাদের কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে মহিলারা ঘরের একটি বিশেষ স্থান নির্ধারণ করতঃ ই'তিকাফে বসতে পারেন।

রোযা ব্যতিরেকে ই'তিকাফ হয় না বলেই অধিকাংশ বুযূর্গানের মত। তবে কেউ কেউ এর বিপরীত মতও পোষণ করেছেন। তবে তাদের সংখ্যা নগণ্য।

ই'তিকাফকালীন সময় মু'তাফিক (ই'তিকাফকারী) প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বাইরে আসতে পারে না। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তবে মহল্লার মসজিদে ই'তিকাফে বসলে জামে' মসজিদে জুমুআ পড়তে, দরসে কুরআন ও ইজতেমায়ী দোয়ায় শামেল হতে পারে। চুল দাড়ি কাটাতে, খাবার খেতে (খাবার এনে দেয়ার কেউ না থাকলে) জানাযার নামায পড়তে, কোন নিকটাত্মীয় রুগীকে দেখতে, কাউকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে মসজিদের বাইরে আসতে পারে। এ প্রসঙ্গে সকলে একমত নয়। অধিকাংশ ফিকাহ্বিদগণই এসব কাজের জন্যে মসজিদের বাইরে আসা পসন্দ করেন না। এসব কর্মই উত্তম মার্গের ই'তিকাফের পরিপন্থী। সুতরাং এসব পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

মূলকথা হলো, মু'তাকিফদের জন্যে সুন্নত সমর্থিত রীতি এই যে, তারা রুগী দেখতে যাবেন না। জানাযায় শামেল হবেন না। স্ত্রীর নিকট যাবেন না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবেন না। ই'তিকাফের জন্যে রোযা জরুরী। এভাবে এমন মসজিদে ই'তিকাফে বসা উচিত যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয়। (সূত্র ঃ ফিকাহ্ আহমদীয়া)

**- মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

## ছোটদের পাতা

# ফুলের তোড়া

(গুলদাস্তা)

[১০ থেকে ১৩ বছর বয়সে ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক]

(২৩তম কিস্তি)

**মা ঃ** যদি কাউকে শত্রুদের বিরুদ্ধে অলৌকিকভাবে রক্ষা করার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে এ অধিকারও আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের। তিনি সকল নবীর চেয়ে অধিক দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছেন। আর যদি খোদাতাআলা কাউকে সাত আকাশের ওপরে নিজ ডান হাতে বসাতে চাইতেন তাহলে এ মর্যাদাও কেবল আমাদের প্রিয় নবীরই (সঃ)। কেননা, তিনি নিজ খোদাকে সবচে' অধিক ভালবাসতেন। আর খোদাও তাকে ভালবাসতেন।

কেননা, কেবল তাঁর খাতিরেই এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর জ্যোতিঃ মুহাম্মদী জ্যোতিঃ থেকে সকল নবী অংশ লাভ করে বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়ে পথভ্রষ্টতার অন্ধকারকে দূর করতে ছিলেন। কুরআন করীমের মত পাক-পবিত্র কিতাবের শিক্ষা কেবল সব মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্যে নির্ধারণ করেন নি বরং কেয়ামত পর্যন্ত ইহা মানবতার কর্ম-পন্থা হিসেবেও নির্ধারিত। কেননা, এতে মানুষ যতটা উন্নতি করেছে, যে অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আছে এসব কিছুর ওপরে কেবলই এ পবিত্র শিক্ষাই আলোক-সম্পাত করে থাকে। আর এখন এ যুগের জন্যে সবচে' বড় যে ফিতনা তাহলো দজ্জাল এবং ইয়া'জূজ ও মা'জূজের ফিতনাও। এ প্রসঙ্গেও সকল নবী নিজ নিজ জাতিকে সতর্ক করে নিয়েছেন যেন এ ভয়ঙ্কর ফিতনাকে কখনও ছড়াতে দেয়া না হয়।

এ ফিতনা থেকে বিশ্ব-মানবতাকে রক্ষা করার লক্ষ্যে আল্লাহ্তাআলা আমাদের প্রিয় নবী সৈয়্যদনা ইমামানা হযরত খাতামান্নবীঈন সল্লাল্লাহু আলায়হেস সালামের এক দাস হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে মনোনীত করেছেন, যিনি ইবনে মরিয়ম (আঃ) হয়ে এসেছেন। তাকে মসীহ্ও বলা হয়েছে। তিনি মাহ্দী অর্থাৎ হেদায়াতদাতাও বটেন।

এ মসীহ্ ও মাহ্দীকে আল্লাহ্তাআলা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হেস সালামের আত্মিক সংস্পর্শের কল্যাণে শক্তি ও সামর্থ্য দান করেন। দোয়ার অলৌকিকত্ব দেন। যার মাধ্যমে এ ফিতনা থেকে মানবতাকে রক্ষা করার উপকরণ সৃষ্টি করে দেন আর যে-ই তাঁর আঁচলে আশ্রয় নেয় সে কেবল খোদাতাআলারই প্রেমিকে রূপান্তরিত হয় না। বরং প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামেরও প্রেমিকে পরিণত হয়ে তাঁর প্রেম থেকে অংশ গ্রহণ করে মানবতাকে মুক্তি দেয়ার জন্যে বের হয়ে পড়ে।

এখন তুমি নিজেই অনুমান করতে পার যে, পৃথিবীতে কে জীবিত আছেন। যার জীবনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যাঁর শিক্ষা জীবিত আছে। যাঁর ধর্ম সমস্ত ধর্মের সত্যতা ও তাদের নবীদের সাক্ষ্যতে পরিণত হয়েছে। যাঁর কথা ও রীতি-নীতি ১৫শ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। যাঁর সাহাবাদের ঘটনাবলী মানুষ নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের মত স্মরণ করে থাকে আর এসব কিছু আমাদের প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের (আমার আত্মা তাঁর উদ্দেশ্যে

উৎসর্গীত) মূলধন, তাহলে পরে আমরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে কীভাবে জীবিত বলে মেনে নেব।

আত্মাভিমান দেখাও, ঈসা জীবিত রয়েছে আকাশে

(আর) সমাহিত মোদের জগতের বাদশাহ্ মাটিতে!

**প্রত্যেক শতাব্দীতে উম্মতে মুহাম্মাদীয়াতে আবির্ভূত মুজাদ্দিদগণের ধারা ঃ**

প্রথম শতাব্দী - হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)

দ্বিতীয় শতাব্দী - হযরত শাফী'(রহঃ)। অন্যদের দৃষ্টিতে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)

তৃতীয় শতাব্দী - হযরত আবূ শরাহ্ (রহঃ) ও আবূল হুসায়েন আশ'আরী (রহঃ)

চতুর্থ শতাব্দী - হযরত আবূ উবায়েদুল্লাহ্ নিশাপুরী (রহঃ) ও কাযী আবূ বকর বাকৃলানী (রহঃ)

পঞ্চম শতাব্দী - হযরত ইমাম গয্যালী (রহঃ)

ষষ্ঠ শতাব্দী - হযরত সৈয়্যদ আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহঃ)

সপ্তম শতাব্দী - হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) ও হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী আজমীরি (রহঃ)

অষ্টম শতাব্দী - হযরত হাফিয ইবনে হাজর আসক্বালানী (রহঃ) ও হযরত সালেহ বিন উমর (রহঃ)

নবম শতাব্দী - হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সাইউতী (রহঃ)

দশম শতাব্দী - হযরত ইমাম মুহাম্মদ তাহির গুজরাতি (রহঃ)

একাদশ শতাব্দী - হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী আহমদ সরহিন্দি (রহঃ)

দ্বাদশ শতাব্দী - হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহেলভী (রহঃ)

ত্রয়োদশ শতাব্দী - হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী (রহঃ) (সূত্র ঃ হুজাজুল কিরামাহ)

চতুর্দশ শতাব্দী - হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মুজাদ্দিদ-এ-আযম শেষ যুগের ইমাম এবং মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ)

**(এর পরে কয়েকটি নযম। এগুলো ওয়াকফে নওদের পাঠ্য পুস্তকে রয়েছে)**

**আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ**

**মা ঃ সন্তান ঃ** যখন ঋতু পরিবর্তন হয় তখন পোষাক-পরিচ্ছদও পরিবর্তন হয়ে যায়। শীতের কাপড় সংরক্ষিত করে রাখা হয়। আর গরমের হালকা- পাতলা কাপড় বের করা হয়। এভাবেই যখন ঠান্ডা আসার সময় হয় তখন লেফ, কম্বল, সুয়েটার বের করে রৌদ্রে দেয়া হয়।

**সন্তান ঃ** আমরা এ কাজটা খুবই পসন্দ করি। পুরনো কাপড় নতুন মনে হয়। পুরোনো কাপড় দেখে হাসি পায়। আমরা কি কখনও এত ছোট ছিলাম।

**মা ঃ** সময় পার হওয়ার সাথে সাথে শরীর বাড়ে তখন কাপড়ও বড় বানাতে হয়। আবার এজন্যেও নতুন কাপড় বানানো হয় যে, কাপড় ছোট হয়ে গেছে। শিশু তো হাফ্প্যান্ট বা ফ্রক জাঙ্গিয়া পড়তে পারে; কখনও ফ্রকের হাতাও থাকে না। কিন্তু যখন বড় হয় তখন পোষাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন এসে যায়।

**সন্তান ঃ** এখন আমার হ্যাফপ্যান্ট পরতে একেবারেই ভাল লাগে না।

**মা ঃ** এটাই তো আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে, ছোট শিশু ও বড় শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদে পার্থক্য হয়ে থাকে। এখন তুমি বলো, কত বছর বয়স থেকে অবশ্যই নামায পড়া আরম্ভ করে দেয়া আবশ্যক।

**সন্তান ঃ** ১০ বছর বয়স থেকে। এমনিতে অভ্যাস সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সাত বছর বয়স থেকে পড়ে থাকে।

**মা ঃ** বাস, পোষাকের জন্যে এটাই উপযুক্ত বয়স। পুরোপুরি পা ঢাকা থাকে। মাথায় ওড়না বা টুপি থাকে।

**সন্তান ঃ** যেভাবে মসজিদে যেতে হয়।

**মা ঃ** জ্বি হ্যাঁ! এছাড়াও যথোপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি খেয়াল রাখা হয়।

**সন্তান ঃ** যেভাবে স্কুলে যাবার সময়, কারও বাড়ীতে যাওয়ার সময়, কোন বুযূর্গের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময়, সভা-সম্মেলনে যাওয়ার সময়।

**মা ঃ** আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) চেয়েছেন, পোষাক-পরিচ্ছদ দেখেও যেন মুসলমানকে চেনা যায়। অন্যান্য ধর্মের লোকদের ন্যায় যেন পোষাক-পরিচ্ছদ পরা না হয়। তাদের মত দেখাতেও যেন চেষ্টা করা না হয়।

**সন্তান ঃ** আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) আমাদেরকে কত ছোট ছোট কথাও বুঝিয়েছেন!

**মা ঃ** এমন একটি কথা বলে দিতেন যেন মানুষ এর পরে অন্যান্য বিষয় নিজেই সিদ্ধান্ত করে নেয়। পোষাকের নাম নিয়ে নিয়ে বলেন নি যে, এটা পরো ওটা পরবে না। বরং একটি নীতি বলে দিয়েছেন যে, এমন পোষাক পরিধান করো যেন দেখলেই মুসলমান বলে মনে হয়। এথেকে আরও একটি কথা মনে পড়লো। আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) এটাও বলেছেন, যখন শিশু ১০ বছরের বয়সে পৌঁছে (ঐ বয়সেই নামায রীতিমত পড়তে হয়) তখন আলাদা বিছানায় ঘুমানো আবশ্যক।

**সন্তান ঃ** এথেকে আর কি জানার আছে?

**মা ঃ** যদি চিন্তা করো তাহলে অনেক বিষয় জানার আছে। যেমন, তোমরা দেখতে পাও যখন শিশু ছোট থাকে, তখন সবার আদর পায়। সবাই কোলে তুলে নেয়। কাঁধে বসিয়ে নেয়। কিন্তু এ কথায় অনুমান করা যায় যে, এখন কোলে বসার চেয়ে আলাদাভাবে বড়দের সাথে বসা উত্তম। খেলা-ধূলার সময়ও এ কথার প্রতি দৃষ্টি রাখে। ছেলেরা আলাদাভাবে ছেলেদের সাথে খেলে মেয়েরা আলাদাভাবে মেয়েদের সাথে খেলে। যেভাবে প্রত্যেক বয়সের আলাদা আলাদা পোষাক-পরিচ্ছদ হয়ে থাকে সেভাবে প্রত্যেক বয়সের লজ্জা শরমের পদ্ধতিও পৃথক হয়ে থাকে।

**সন্তান ঃ** যেমন।

**মা ঃ** যেমন গোসল করতে পোষাক-পরিচ্ছদ বদলাতে পুরোপুরি পর্দার প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক। কিশোরীরা নিজেদের বুযূর্গদের মামা, খালু, ফুফা, চাচা, তালই যেভাবে সব বুযূর্গ আত্মীয়-স্বজন ও অতিথিদের সামনে গেলে উড়না ব্যবহার করবে এবং দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখবে।

**সন্তান ঃ** শব্দও নিম্নস্বরে বলবে!

**মা ঃ** না বাবা, কথা না বললে ভাল লাগে না। কথা বলে তো সুস্পষ্ট। এক একটি শব্দ যেন বুঝা যায়। এমন যেন না হয় যে, অর্ধেকটা কথা বুঝা যায় আর অর্ধেকটা বুঝা-শুনার জন্যে বার বার কি বল্লে, কি বল্লে বলতে হয়। আহমদী শিশুরা বীর হয়ে থাকে। কথা সুস্পষ্ট, সত্য ও উচ্চস্বরে বলে। মুখ কালো করে কথা বলে না; কথায় অন্যায়ের ছাপ না থাকে কিন্তু স্বর উচ্চ হয়। যে দেখে সে যেন বলে, ভাল পরিবার ও ভাল জামাতের সন্তান।

**সন্তান ঃ** আমরা এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবো।

**মা ঃ** খোদা তোমাকে আমল করার ও অন্যদেরকে সঠিকভাবে বুঝানোর সৌভাগ্য দিন। একটি হাদীস সব সময় মনে রাখবে ঃ

"নির্লজ্জতা মানুষকে কদাকার করে অন্যদিকে লজ্জা সুন্দর ও শোভামন্ডিত করে।' (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

# জামাতে নামায পড়ার গুরুত্ব

**মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজেদেরকে জামাতে নামায পড়ার জন্য অভ্যস্ত করে তোলা।**

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশ ঃ

বস্তুত ধর্মের প্রধানতম অংশ, যা এর মন ও মস্তিষ্কস্বরূপ, তা হলো একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত। আল্লাহ্‌র ইবাদতকে ছেড়ে দিলে ধর্ম শুধু আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে থেকে যাবে এবং খোদাতাআলার সাথে সম্পর্কের দাবী শুধু প্রতারণা হবে। এ জন্যই আল্লাহ্‌তাআলা মু'মিনদের প্রথম গুণ সম্বন্ধে বলেছেন যে, 'ইউকীমুনাস্‌সলাতা' তারা নামাযকে কায়েম করে। অর্থাৎ নিজেও জামাতের সাথে নামায পড়ে, যার প্রতি 'ইউকীমুনা' শব্দটি ইঙ্গিত করছে, এবং অপরকেও নামায পড়ার জন্য উপদেশ দিতে থাকে, যেন জামাত হিসাবে নামায পড়বার বিষয়ে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এখানে যদি একা নামায পড়ার কথা বলা হতো তা'হলে' 'ইউসাল্লুনা' অর্থাৎ 'নামায পড়' বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা 'ইউসাল্লুনা' ব্যবহার করেন নি বরং 'ইউকীমুনাস্ সালাতা' শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফের অন্যান্য জায়গায়ও 'আকীমুস্ সালাতা অথবা 'একামাস্ সালাতা' শব্দগুলোই ব্যবহৃত হয়েছে। এবং 'আকামাত' (অর্থাৎ কায়েম বা প্রতিষ্ঠা) সর্বদা বা-জামাত নামাযেই হয়ে থাকে।

সুতরাং মু'মিনদের একটি বৈশিষ্ট্য এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে বা-জামাত নামায পড়ে থাকে। এবং না শুধু নিজেই নামাযে মনযোগী হয় বরং অপরকেও নামায পড়ার জন্য উপদেশ দিতে থাকে। আমি দেখেছি অনেকে নিজেরা মনযোগসহ নামায পড়ে থাকে কিন্তু নিজেদের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের প্রতি উদাসীন। বাস্তবিকই যদি তারা আন্তরিক ও খাঁটি নিষ্ঠাবান হতো তাহলে এটা হতেই পারে না যে, কোন সন্তান, স্ত্রী, অথবা ভাইবোন নামায ছেড়ে দেবে আর মানুষ তা সহ্য করবে।

মোট কথা নামায প্রতিষ্ঠা করা এক অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। নিজে নামায পড়া, অন্যকে পড়ানো এবং আন্তরিক নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার সাথে পড়া, ওযূ করার পর ধীরে ধীরে সঙ্গবদ্ধভাবে (বা-জামাত) নামায পড়া এর অন্তর্গত। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নামায খোদা ও বান্দার মধ্যে সাক্ষাৎকারের একটি উপায়, যেন এর মাধ্যমে ঐ ঐশী গুণাবলী যা নবীর মধ্যস্থতায় আল্লাহ্‌তাআলা সৃষ্টি করতে চান, মু'মিনদের মধ্যে তার উন্মেষ ঘটে এবং তারা আল্লাহ্‌র রঙ-এ রঙিন হয়ে যান।

রসূলে করীম (সঃ) বা-জামাত নামাযকে এরূপ মর্যাদা দান করতেন যে, একবার এক অন্ধ ব্যক্তি তাঁর (সঃ) কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার বাড়ী মসজিদ থেকে অনেক দূরে, মসজিদে আসতে আমার খুব কষ্ট ও অসুবিধা হয়। এ কারণে যদি আমাকে অনুমতি দান করেন তাহলে আমার ঘরেই নামায পড়ে নেবো, (সেখানে মদীনাতে কাঁচা (মাটির) ঘর ছিল। বৃষ্টি বাদলার দিনে গলি দিয়ে পানি বয়ে যেতো। দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে পানি বেয়ে যাবার ফলে দেয়াল ভেঙে যেতো। একারণে পানির ধাক্কা থেকে দেয়ালকে রক্ষা করতে লোকেরা দেয়ালের ভিত ঘেষে রাস্তায় পোড়া ইট রেখে দিতো। পাঞ্জাবীতে এই ইটকে খাংগার বলা হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও রাস্তায় পোড়া ইট রাখার প্রচলন আছে। একজন অন্ধ লোকের পক্ষে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলা বিপজ্জনক। এ জন্য সবসময়ই তাকে দেয়াল ঘেঁষে এবং দেয়াল ধরে ধরে চলতে হয়। পোড়ানো ইট বিছানো এরূপ দেয়ালের পাশ দিয়ে চলতে যেয়ে সেখানে পড়ে গিয়ে আহত হওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

অন্ধ ব্যক্তিটি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খেদমতে নিবেদন করলেন- 'যেহেতু দেয়ালের গোড়ায় পাথর রাখা থাকে এবং পাথরের মাঝখান দিয়ে আমি চলতে পারি না। এবং যদি দেয়ালের পাশ দিয়ে মসজিদে আসি তাহলে পড়ে গিয়ে আহত হবার আশঙ্কা আছে, এ কারণে যদি আমাকে অনুমতি দান করেন তাহলে আমি ঘরে নামায পড়ে নিতে পারি।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন ঃ 'আচ্ছা মসজিদে আসতে যদি আপনার বিপদের আশঙ্কা থাকে তাহলে ঘরেই নামায পড়ে নিবেন,' একথা শুনে অন্ধ লোকটি তার বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। কিন্তু সে বেশি দূরে না যেতেই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে ডেকে আনতে একজন সাহাবীকে পাঠালেন। তিনি ফিরে এলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে বললেন, "আপনার ঘর থেকে কি আযানের আওয়াজ শুনা যায়?" উত্তরে ব্যক্তিটি বললেন, "হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ্। আযানের আওয়াযতো ঘরে পৌঁছে যায়।" হুযূর (সঃ) তখন বললেন, "আযানের আওয়ায যেহেতু আপনার ঘরে শুনতে পান তাই মসজিদে আসার পথে হোঁচট খেয়ে আহত হলেও অবশ্যই মসজিদে আসবেন।" অনুরূপভাবে একবার রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছিলেন, - "যখন ইশা অথবা ফজরের নামাযের সময় হয়, তখন আমার ইচ্ছা হয় যে, আমার জায়গায় কাউকে দাঁড় করিয়ে আর কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তাদের কাঁধে খড়ির বোঝা চাপিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করি এবং যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিই।" এখন দেখুন, বাস্তবে যদিও তিনি তা করেন নি কিন্তু এটাতো বুঝা গেল যে, বা-জামাত নামাযের ব্যাপারে তিনি কতটা আন্তরিক ছিলেন? এ দৃষ্টান্ত দ্বারা মানুষকে তিনি বুঝিয়েছেন যে, যারা বা-জামাত (সকলে মিলিতভাবে) নামায না পড়বে, নিজেদেরকে তারা দোযখের ইন্ধন করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে।

একথা ঠিক যে দুনিয়াতে আরো অনেক পুণ্য কর্ম রয়েছে কিন্তু নামাযকে আল্লাহ্‌তাআলা সব থেকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এবং কোন অপারগতা অথবা অপরিহার্য কাজের প্রতিবন্ধকতা না থাকলে নামাযের সময় মসজিদে আসা খুবই জরুরী। অপরিহার্য কাজ বলতে এই বুঝায়, যেমন কোথাও আগুন লেগে গেল সেক্ষেত্রে আগুন নেভানোটা হলো জরুরী কাজ, নামায পরে পড়ে নিতে হবে। কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম ধর্মী অবস্থা ছাড়া যে ব্যক্তি জামাতে নামায পড়তে দুর্বলতা প্রদর্শন করবে, সে এক বড় অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

**ইন্নাস্ সালাতা তান্‌হা আনিল্ ফাহ্‌শায়ে ওয়াল মুনাকারে-** অর্থাৎ নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কায থেকে বিরত রাখে (সূরা আনকাবূত আয়াত ঃ ৪৬)।

নামায মানুষকে ঐ সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে যা তার সত্তার সাথে সম্পর্কিত। এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর এরূপ অন্যায় কর্ম থেকেও বিরত রাখে। কারণ বা-জামাত অর্থাৎ সকলে একত্রে নামায পড়া মুসলমানদের জন্য দৈনিক পাঁচবার নির্ধারিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে জামাতে নামায পড়ার অভ্যাস কায়েম হয়ে গেলে সময়ের এক বিরাট অংশ তারা

আল্লাহ্‌র আরাধনায় (ইবাদতে) নিরত থাকবে এবং নামাযের জন্য ব্যয় করা এ সময়টি তাদেরকে অশালীন ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচাতে থাকবে। অনুরূপভাবে নামাযে যখন নিজের জন্য এবং অপরের জন্যও দোয়া চলতে থাকবে, তখন সেই দোয়া খোদাতাআলার আশীষ ও করুণাকে আকর্ষণ করে তার নিজের সংশোধনেরও কারণ হবে, অন্যদেরও সংশোধন এবং উন্নতির কারণ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে নামাযে কুরআন করীমের যে আয়াতগুলো পাঠ করা হয় এবং বেশি বেশি প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করা হয় তা মানুষের অন্তরে এরূপ প্রভাব বিস্তার করে যে, মানুষ পাপকে ঘৃণা করতে থাকে।

সুতরাং মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরী কাজ হলো নিজেকে বা-জামাত নামাযে অভ্যস্ত করার জন্য চেষ্টারত থাকা।

নামায খোদাতাআলার সাথে সাক্ষাতের এক উপায়স্বরূপ। তাই ইসলামের সিদ্ধান্ত হলো- বিরতিসহ খোদাতাআলাকে স্মরণ করা এবং নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া যদিও তখন যুদ্ধ চলছে, শত্রু গোলাগোলী বর্ষণ করছে, পানির মত রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তা সত্ত্বেও ইসলাম এটা আবশ্যকীয় বলে আখ্যা দেয় যে, যখন নামাযের সময় হয়ে যায় যদি সম্ভব হয় তখন মু'মিন যেন আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে যায়। (অতি ভয়াবহ আক্রমণের অবস্থায় সেই নামায যদি জমা করা না যায়, ওটাকেও জমা করার আদেশ রয়েছে। রসূলে করীম (সঃ) স্বয়ং একবার চার ওয়াক্তের নামায জমা করেছেন) নিঃসন্দেহে যুদ্ধাবস্থায় নামাযের বাহ্যিক আকারে কিছুই পরিবর্তন ঘটে কিন্তু নামায বাদ দেয়া বৈধ হবে না।

নামায আধ্যাত্মিক দেহের সংশোধনের এক উপায়স্বরূপ। যেরূপ একজন রোগী একথা বলে মৃত্যু থেকে রেহাই পেতে পারে না যে, অসুস্থ থাকার কারণে সে (তার খাদ্য) রুটি খেতে পারে নি। অনুরূপভাবে এক আধ্যাত্মিক দেহও এ কৈফিয়ত দিয়ে মৃত্যু থেকে রেহাই পাবে না যে, সে অসুস্থতার জন্য নামায পড়তে পারে নি। যদিও কোন একজন রোগী অসুস্থতার কারণে খাবার খেতে পারে না- দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ পাকস্থলীতে গিয়ে খাদ্য অবস্থান করতে পারে না, বমি হয়ে যায়। অথবা খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করে না। অথবা নাড়ি ভুঁড়িতে কোন রোগ হয়েছে বলে খাদ্য সেখানে থাকতে পারে না অথবা হজম হয় না, তথাপি আমরা একথা বলতে পারি না যে, সে মরবে না, কারণ খাদ্য ছাড়া মানব দেহ বাঁচতে পারে না। তেমনিভাবে কোন ব্যক্তি অজুহাত দেখিয়ে নামায না পড়লেও সে মরবে। অজ্ঞতাবশত কোন ব্যক্তি এটা মনে করে যে, যেহেতু সংগত কারণে তার নামায বাদ পড়েছে এতে কিছু হবে না। কিন্তু তার এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ সংগত বা অসংগত যাই হোক না কেন, ফলাফল অবশ্যি বের হবে। তোমার উপার্জিত পয়সা দিয়ে তৈল কিনে মাথায় দাও অথবা চুরি করা তৈল লাগাও মাথা তৈলাক্ত হয়ে যাবে আর চুরি করা তৈলে মাথা শুকনো থাকবে। দুটোর ফলাফল একই হবে।

সুতরাং বা-জামাত নামাযের অভ্যাস কর এবং নিজ নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকেও এতে অভ্যস্ত করাও কারণ শিশুদের স্বভাব-চরিত্র গঠনে এবং সংশোধনের জন্য আমার ধারণামতে জামাতে নামায পড়াই হলো সব থেকে জরুরী। আমার জীবনে এত লোকের সাথে সাক্ষাৎ এবং বিভিন্ন বিষয়ে যাচাই-বাছাই করার সুযোগ লাভ হয়েছে এবং একই সাথে খোদাতাআলা আমার স্বভাবকেই এমন অনুভূতিপরায়ণ বানিয়েছেন যে, শতবর্ষ আয়ূধারী ব্যক্তি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় দুনিয়ার উঁচু-নীচু ও ভাল মন্দের এতটা উপলব্ধি করতে পারেন নি, যতটা আমি পেরেছি এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতায় পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে বা-জামাত নামাযের চাইতে অধিক কার্যকরী ব্যবস্থা আমি দেখি নি। পুণ্য লাভে সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী হলো বা-জামাত নামায। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখে (সূরা আনকাবূত আয়াত ঃ ৪৬)।

যদি আমি এই আয়াতের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতে সমর্থ না হই তাহলে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করবো অন্যথায়, আমার ধারণায় বা-জামাত নামাযে অভ্যস্ত ব্যক্তি পাপ কর্মে এগুতে থেকে ইবলীসকেও যদি পেছনে ফেলে যায়, তথাপি তার সংশোধনের সুযোগ বিনষ্ট হয় নি। এক অণু বা তিল পরিমাণও আমি ভাবতে পারি না যে, এক ব্যক্তি বা-জামাত নামাযে নিয়োজিত থাকবে আর তার সংশোধনের কোন সুযোগ থাকবে না! যতই অন্যায়ে সে লিপ্ত থাক না কেন পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে সে তার নামাযকে কার্যকর করেছে। এতে আমার এরূপ পূর্ণ প্রতীতি জন্মেছে যে, আমি খোদাতাআলার কসম খেয়ে বলতে পারি, বা-জামাত নামাযে অনুরক্ত ব্যক্তি, সে যতই অন্যায়কারী হোক না কেন, নিশ্চয় তার সংশোধন সম্ভব এবং সে নষ্ট হবে না। আমি উন্মুক্ত হৃদয়ে বলতে পারি যে, শেষ পর্যন্ত তার সংশোধনের সুযোগ রয়েছে।

বয়স্ক ব্যক্তি যদি নিজে বা-জামাত নামায না পড়ে তবে সে মুনাফিক। কিন্তু যে ব্যক্তি আপন সন্তানদেরকে বা-জামাত নামায পড়ার অভ্যাস করায় না সে তাদের খুনী হত্যাকারী। পিতা-মাতা যদি নিজ সন্তানদের বা-জামাত নামাযে অভ্যস্ত করেন, তাহলে তারা কখনো এ অবস্থার সম্মুখীন হবে না যখন তাদের সম্বন্ধে বলা হবে- "এদের সংশোধন অসম্ভব এবং তারা চিকিৎসার অযোগ্য"। বস্তুত যে সকল লোক নামায পড়েন- আল্লাহ্‌তাআলার পবিত্রতা, প্রশংসা ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেন, খোদাতাআলা তাদের পুণ্য কর্মের পাল্লাকে ভারি করতে থাকেন এবং মানুষের উন্নতি হতে থাকে।

পাপ জড়বাদিতার সাথে সম্পর্কের পরিণতি। এ জগত থেকে মানুষ উর্ধ্বগতি হতে থাকলে জড়বাদিতা থেকে তার সম্পর্ক ক্ষীণতর হতে থাকে এবং পরিণামে সে পাপ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

তেমনিভাবে কুরআন করীমে এসেছে- "সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে ক্ষমা করবো।" (২ঃ১৫৩) অর্থাৎ তোমাদেরকে আমার নৈকট্য দান করবো এবং সকল দুঃখ-বিপদে তোমাদের সাহায্য করবো। উল্লেখ্য যে- যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য লাভ করবে সে অনেক মন্দ কাজ থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আল্লাহ্‌তাআলাও তাদের সাথে প্রেম ও ভালবাসার ব্যবহার করবেন। এ কারণেই ইসলাম সকল জনসভায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও ইবাদতের প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছে।

সুতরাং এক্ষেত্রে মু'মিনের জন্য এটা অবশ্য করণীয় (ফরয) যে, সে নিজের সময়কে এরূপভাবে অতিবাহিত করবে যেন সারাক্ষণ যিক্‌রে ইলাহীতে নিরত থাকে এবং উৎসাহ ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করে।

অতএব নিজের মধ্যে যিক্‌রে ইলাহীর অভ্যাস সৃষ্টি কর যাতে করে আল্লাহ্‌র সাথে তোমার সম্পর্ক বেড়ে যায়। তোমার মধ্যে সাহস এবং দৃষ্টিতে প্রভাব সৃষ্টি হয়, দুশমনের মনও এতে প্রভাবিত হয় এবং যে নিজেই বলে উঠে যে "এ লোক সত্যিই আধ্যাত্মিকতার মূর্ত প্রতীক"।

(৫-৬-২০০২-এর সাপ্তাহিক বদরে 'তফসীরে কবীর' থেকে সংকলিত)

অনুবাদ ঃ **মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা**

## কুরআন করীম সমগ্র মানব-সন্তানের জন্যই হেদায়াতস্বরূপ

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) কুরআন করীম-এর বিশ্বব্যাপী শিক্ষা সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলেন ঃ

"কুরআন করীম-এর অনেক আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন করীম কেবল মুত্তাকীদের জন্যই নয় বরং সমগ্র মানব সন্তানের জন্যই হেদায়াত বা পথ-প্রদর্শক। আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ মকামের অধিকারী হোক অথবা নিম্ন মকামের হোক। কেননা আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, **'হাযা বাইয়্যান্নালিন্নাসি ওয়া হুদান** (আলে ইমরান ১৩৯)। এ কুরআন সমগ্র মানুষের জন্য জরুরী বিষয়াবলী বর্ণনা করছে আর তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছে। এ আয়াত বর্ণনা করছে কুরআনী হেদায়াত কেবল মুত্তাকীদের জন্যই নয় সমগ্র মানবের জন্য। অনুরূপভাবে কুরআনের জন্য আরেক স্থানে আছে **হুদাল্ লিন্নাসি ওয়া বায়্যিনাতিম মিনাল হুদা** (সূরাতুর বাকারা-১৮৬)। অর্থাৎ কুরআন করীম সমগ্র মানবের জন্য হেদায়াতস্বরূপ আর এরই মাঝে হেদায়াত লাভের সমস্ত উপকরণাদি বিদ্যমান। এভাবেই বলা হয়েছে, **ওয়া লাক্বাদ সাররাফনা ফি হাযাল কুরআনা লিন্নাসি মিন কুল্লি মাসালিন**। অর্থাৎ কুরআনে সমগ্র মানবের কল্যাণার্থে হোক না মুত্তাকী বা অ-মুত্তাকী তবুও প্রত্যেক কথাকে সর্বোচ্চ উপমা বা সৌন্দর্যের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে (সূরাতুল কাহাফ ঃ ৫৫)। অর্থাৎ সব মানুষের অবস্থা অনুযায়ী এর মধ্যে এমন শিক্ষা আছে যা তাকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। আর তার আধ্যাত্মিক চাহিদাকে পূর্ণ করে দেয়। অনুরূপভাবে (আল্লাহ্) বলেছেন, **ওয়া লাক্বাদ যারাব্না লিন্নাসি ফী হাযাল্ কুরআনি মিন কুল্লি মাসালিন** (সূরতু রূম ঃ ৫৯ আয়াত) এ আয়াতেরও প্রায় ঐ রূপই অর্থ যা উপরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য কেবল এটুকুই। পূর্বের আয়াতে **সাররাফনা** বলা হয়েছিল এখানে **যারাবনা** বলা হয়েছে। এবং **সাররাফনা**-র সাথে বিষয়ের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, বিভিন্ন রীতিতে এ হেদায়াতকে বর্ণনা করা হয়েছে। আর **যারাবনা**-এর মধ্যে এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, স্বভাবের সঠিক উপমাসমূহ ও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের বিপরীতে রেখেই হেদায়াতকে বর্ণনা করেছে। এভাবে বর্ণিত হয়েছে, **ওয়া লাক্বাদ সাররাফ্না ফী হাযাল কুরআনি লিইয়াযযাক্কারু** অর্থাৎ কুরআন করীমে হেদায়াতের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং (এ দ্বারা) কল্যাণ প্রাপ্ত হয় (সূরাতু বনী ইসরাঈল ৪২ আয়াত)। এখানেও কেবল মুত্তাকী ও মু'মিনদের জন্য হেদায়াতকে নির্ধারিত করা হয় নি বরং সমগ্র মানবের জন্যই বর্ণনা করা হয়েছে" (তফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, ৯৫ পৃঃ)।

[মাসিক আনসারুল্লাহ্ আগষ্ট ০২ সংখ্যার সৌজন্যে]

উপস্থাপন ও অনুবাদক ঃ **আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মোয়াল্লেম**

**কবিতা**

## আমার প্রিয় কে? সে কেমন?

**হযরত মুসলেহ্ মাওউদ ও খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)**

আমার প্রিয়দের বিষয়ে আমি কখনো চাইবো না
তারা তুচ্ছ প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হবে আর তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে সঙ্কীর্ণ
তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বাঘের মত গর্জন করবে
সামান্য দোষ দেখলে তারা বকতে বকতে মুখে ফেনা তুলে ফেলবে
তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের বিষয়ে নানা আকাঙ্ক্ষা লালন করে যাবে
তারা ছোট ছোট মনোবাসনাকে নিজ জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে বসবে
বাড়ীতে বসে মুখের কথায় তারা শত্রু নিধন করে যাবে
আর কাজের কথা বললেই তারা ইতস্ততঃ করবে আর ভীত হয়ে পড়বে
শিয়ালের মত তারা বাঘের শিকার করা জন্তু খেতে উদগ্রীব থাকবে
আর তারা বসে বসে এদের উচ্ছিষ্ট খাবার স্বপ্নে হবে বিভোর
হে আমার ভালবাসার অন্বেষী! এই হলো আমাদের হৃদয়ের চিত্র
এবার তুমি নিজেকে যাচাই কর, তুমি নিজে এসব বিষয়ে কেমন?
যদি তোমার সাহস অল্প হয়ে থাকে, যদি তোমার ইচ্ছা ও বাসনাই মৃত হয়ে থাকে
যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা সীমিত থাকে, যদি তোমার চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে
তোমার সাথে সম্পর্ক গড়ে আমিও কি তবে নীচ হয়ে যাবো?
জান্নাতের সুউচ্চ মীনার হয়েও কি আমি তোমার কারণে জাহান্নামে পদদলিত হব?
যদি আমার ভালবাসা পেতে চাও তাহলে তোমার দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত কর
পরিকল্পনা জল্পনা-কল্পনা বাদ দাও, গিয়ে সরাসরি তকদীরকে জয় করে নাও
আমি এক-অদ্বিতীয় খোদার অতি আদরের পাত্র আর এক অদ্বিতীয় খোদা হলেন আমার সবচেয়ে প্রিয়
যদি নিজ ক্ষেত্রে তুমি অদ্বিতীয় হতে পারো, তুমি আমার চোখের মণিতে পরিণত হবে॥
তুমি সারা জগতে এক অসাধারণ ব্যক্তি হবে তোমার কোন তুলনা বা শরীক থাকবে না
তুমি জগদ্বাসীকে দান করে বেড়াবে কিন্তু তোমার হাতে ভিক্ষার ঝুলি থাকবে না॥

অনুবাদ ঃ **মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী**

## ইউ, কে জামাতের সালানা জলসা

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে, হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) যুক্তরাজ্য জামাতের ৩৭তম সালানা জলসার তারিখ ২৫-২৭ জুলাই, ২০০৩ তারিখ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার নির্ধারণে অনুমোদন দিয়েছেন, আল্হামদুলিল্লাহ্।

এ জলসার সফলতার জন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

*- নির্বাহী সম্পাদক*

## আখবারে আহমদীয়া

ওকীলে আলা তাহরীকে জাদীদের সর্বশেষ সার্কুলার মারফত জানা গিয়েছে যে, হুযূর (আইঃ) হাসপাতাল থেকে স্বীয় আবাসস্থলে ফিরে এসেছেন। তাঁর অবস্থা দ্রুত উন্নতির দিকে। তিনি তাঁর দাপ্তরিক কাজ-কর্ম দেখছেন ও এ ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন।

হুযূর (আইঃ)-এর পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্যে জামাতের বন্ধুগণকে দোয়া জারী রাখার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

*- নির্বাহী সম্পাদক*

# বন্ধুগণ রমযানের অঙ্গীকার মনে রাখুন। এ মাস নফসের সংশোধনের বিশেষ মাস।

## মূল ঃ হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব

বিগত কয়েক বছর যাবত এ অধম জামাতের বন্ধুদের খেদমতে এই তাহরীক করতে থাকে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইচ্ছা অনুসারে বন্ধুদের উচিত রমযান মাসে নিজেদের কোন দুর্বলতা সম্পর্কে মনে মনে খোদার কাছে অঙ্গীকার করা উচিত যেন তিনি ভবিষ্যতে এ দুর্বলতা থেকে চিরতরে রক্ষা পান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ নির্দেশ খুবই প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ প্রথমতঃ মানুষের জন্য ফরয, সে যেন সব সময় নিজের নফসের হিসাব করে নিজের দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করতে থাকে। আর নিজের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খোদার নিকটবর্তী হতে থাকে। এছাড়া পবিত্র রযমান মাসে নিজের বিশেষ আধ্যাত্মিক পরিবেশ, নামায, রোযা, নফল, তেলাওয়াতে কুরআন মজীদ, যিক্‌রে ইলাহী এবং সদকা ও খয়রাতের সাথে নফসের নিরীক্ষণ ও দুর্বলতা পরিহারের যথাযথ সম্পর্ক আছে। প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে, ঐ সময় লোহাকে যে কোন রূপ দেয়া যায় যখন তা নরম ও গরম থাকে। রযমান মাস নফসের সংশোধনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সেজন্য ভাই-বোনদের উচিত, তারা যেন এ রমযানের সোনালী সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। নিজেদের দুর্বলতাকে দূর করার চেষ্টা করে। আর নিজের কোন বিশেষ দুর্বলতাকে সামনে রেখে খোদার কাছে অঙ্গীকার করে, তিনি ইন্‌শাআল্লাহ্‌তাআলা ভবিষ্যতে এ দুর্বলতা থেকে দূরে থাকবেন। আর কখনও এতে লিপ্ত হবেন না। এ অঙ্গীকার কারোর কাছে প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক সময়ে প্রকাশ করা আল্লাহ্‌তাআলার সাত্তার (দোষ-ত্রুটি গোপনকারী) নামের খেলাপ। এ জন্য কেবলমাত্র মনে মনে অঙ্গীকার করা যথেষ্ট। কিন্তু এ অঙ্গীকার এরূপ- 'প্রাণ যাবে কিন্তু কথা না যাবে'- এ কথার সত্যায়নকারী হয়। কারণ "খোদাতাআলার সাথে করা প্রত্যেক অঙ্গীকার সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

এই অঙ্গীকারের জন্য মানুষ নিজের আত্মার পর্যালোচনা করে নিজের জন্য কিছু উপযুক্ত দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারে। তবে ভাল হয় যদি এরূপ দুর্বলতাকে বাছাই করা হয় যা অন্যের জন্য হোঁচট কিংবা খারাপ দৃষ্টান্তের কারণ হয়। আর জামাতের দুর্নাম হয়। যদি এরূপ সম্ভব না হয় তবে এরূপ দুর্বলতাকে ত্যাগের জন্য অঙ্গীকার করতে হবে যা মানুষ তার নিজের অবস্থার প্রেক্ষিতে তাড়াতাড়ি করার শক্তি রাখে। আর মনে রাখা উচিত, একটা দুর্বলতাকে ত্যাগ করা অনুরূপভাবে দ্বিতীয় দুর্বলতা। ত্যাগের শক্তি সৃষ্টি করে। যেমনিভাবে একটি পুণ্য করা অন্য পূণ্যের রাস্তা খুলে দেয়। নীচে উদাহরণ হিসেবে কিছু পরিচিত দুর্বলতার উল্লেখ করা হল যাতে বন্ধুদের নির্বাচনের সুবিধা হয়।

(১) **সবার প্রথমে আছে নামাযে অলসতা**- নামাযে অলসতার মধ্যে বাজামাত নামায কম পড়া, নামায কেবল ঠোকর মেরে পড়া এবং পরিপাটি করে না পড়া আর এর বাহ্যিক ও গুপ্ত শর্তসমূহ সম্পর্কে অবহেলা করা সব কিছু এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে আছে, নামায মু'মিনের জন্য আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎকার অর্থাৎ নামায যারা পড়ে তারা খোদার সাথে কথা বলে। সুতরাং নামায না পড়া কিংবা নামাযে অলসতা করা অতি বড় পাপ।

(২) **জামাতের চাঁদাতে অলসতা** বড় দুর্বলতার মধ্যে অন্যতম। যার মধ্যে ইসলাম ধর্মের আইন মোতাবেক চাঁদা না দেয়া কিংবা কোন খাতে চাঁদা দেয়া আবার কোন খাতকে অবহেলা করা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এ যুগে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ এবং সত্য ধর্মের প্রচারের যথাযথ সময়। চাঁদা প্রথম স্তরের পুণ্য কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর আমার অভিজ্ঞতা হল, এ জন্য অর্থ কখনও কমে না বস্তুত এতে বরকত হয়। সদর আঞ্জুমানের চাঁদা, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা, ওসীয়তের চাঁদা, সালানা জলসার চাঁদা, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই মোবারক চাঁদা। এ সকল চাঁদা "মিম্বা রাযাকনাহুম ইয়ুনফিকুন" (আমরা তাহদিগকে যে রিযক দিয়েছি উহা হইতে খরচ করে) এর অন্তর্ভুক্ত। যে সম্পর্কে কুরআন মজীদের শুরুতেই তাকিদ করা হয়েছে।

(৩) **লেনদেন ও ব্যবসায়** অসততার পাপ এ যুগে মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেছে। কেবল মাত্র মানুষের চরিত্রেই নয় বস্তুত সমন্বিত পুণ্য বিষয়ের ওপর এর প্রচন্ড প্রভাব পড়েছে। আঁ হযরত (সঃ) নির্দেশ হল, "যে ব্যক্তি অন্যের সাথে প্রতারণা করে এবং আত্মসাতের মত অপকর্ম করে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক হতে পারে না। সকল সত্যাশ্রয়ীর জয়ের জন্য ইহা যথেষ্ট। কুরআন মজীদ ও এরূপ লোকদের জন্য যারা প্রতারণা করে এবং অন্যের হক নষ্ট করে ধ্বংসের ভয় দেখিয়েছে। এভাবে মিথ্যা বলার অভ্যাস আর সুদখোরীও এর মধ্যে আসে। সুদ সম্পর্কে কুরআন মজীদ বলে, সুদ গ্রহণকারী খোদাতাআলার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়। আর মিথ্যা তো পাপের ডিম তৈরীর যন্ত্র।

(৪) **উৎকোচ বা ঘুষ কবিরা গোনাহের মধ্যে একটি**। সকল আহমদীর আঁচল এ অভিশাপ থেকে এরূপ পবিত্র থাকা উচিত যেরূপ ধোপার ঘর থেকে ফেরত আসা কাপড় ময়লা ও আবর্জনা মুক্ত হয়। আঁ হযরত (সঃ) বলেন, আর রাশি ওয়াল মুরতাশি কিলাহুমা ফিন্নার- ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা দু'জনেই আগুনের মধ্যে আছে। কারণ এতে জাতীয় চরিত্র নষ্ট ও দেশ ধ্বংস হয়। আমি এ সব কথা কেবল মাত্র দৃষ্টান্ত হিসেবে লিখছি। প্রকৃতপক্ষে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, খোদার ফযলে আহমদীয়া জামাতের বেশির ভাগ লোক এ দুর্বলতা থেকে পবিত্র।

(৫) **মদ্য পানকে উম্মুল খাব্বায়েস** বা সকল নষ্টের জননী বলা হয়েছে। এ যুগে ইহা সাধারণ বিষয় হয়ে গেছে। আমি একীন রাখি যে, জামাতের বন্ধুরা খোদার ফযলে এ অপবিত্র অভ্যাস থেকে সুরক্ষিত আছেন। আজকাল এ পাপ নব্য শিক্ষিতদের মাঝে বিশেষ করে পাশ্চাত্যে জন্মগ্রহণকারীদের মাঝে এটি প্রচলিত হয়ে গেছে। আমার ভয় হয় কিছু অপরিপক্ক প্রকৃতির যুবক বিশেষ করে সৈন্যদলের যুবকরা যেন এ দুর্বলতায় লিপ্ত না হয়ে যায়। তারা নিজেরা তো মদ থেকে একধারে থাকে কিন্তু নিজের নিমন্ত্রিতদের মদপান করায়। এরূপ কাজ রসূল পাক (সঃ)-এর উপদেশের সম্পূর্ণ বিরোধী। এভাবে জুয়া মদের মত চরিত্র খারাপ করা পাপ। কুরআন করীমে মদের সাথে এর নাম উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে। আজকাল তাস খেলায় জুয়াবাজী এবং ঘোড়াদৌড়ে জুয়ার শর্ত লাগানোর প্রচলন হচ্ছে।

(৬) **পর্দা না মানা রোগও** আজকাল হয়ে গেছে। বিশেষতঃ পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই এ দুর্বলতা অনেক বেড়েছে। আর ফ্যাশানের অনুসরণে নিজেদের স্ত্রীদের বেপর্দায় পুরুষদের মজিলসে আনা এবং বেপর্দা অবস্থায় উন্মুক্ত স্থানে ঘোরানো কুরআন করীমের নির্দেশ "ওয়ালা ইউব দীনা যীনাতাহুন্না"-কে পেছনের দিকে ফেলার রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। সত্য ধর্ম কখনও একথা বলে না, মেয়েরা ঘরে বন্দী থাকুক, তারা শিক্ষা না পাক, অথবা তারা জাতীয় জীবনে অংশ না নিক। ধর্ম কেবল এ বিষয়ে কিছু বিজ্ঞতাপূর্ণ সীমা নির্ধারণ করে। যা স্ত্রী-পুরুষ দু'জনে চরিত্রের হেফাযতের জন্য প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের আহমদী যুবকদের খৃষ্টানদের অন্ধ অনুকরণ এবং অন্যদের ভাঁড়ামী থেকে রক্ষার জন্য হুঁশিয়ার থাকতে হবে। (সত্য ধর্মের)

প্রাথমিক সময়ে মুসলমান মেয়েরা সুন্নত অনুসারে পরদা করত। জাতীয় জীবনেও অংশ নিত। অনেক মহিলা খুব উল্লেখযোগ্য সেবা করেছে। আমি আহমদীয়তের বাইরের মেয়েদের কাছে এ আশা রাখি যে, তারাও এ বিষয়ে নিজেদের স্বামী ও পিতার ওপর ভাল প্রভাব বিস্তার করবে।

(৭) সত্য ধর্ম নিঃসন্দেহে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং জাতীয় প্রয়োজন অনুসারে অধিক স্ত্রীর অনুমতি দেয়। সাথে সাথে কঠিনভাবে নির্দেশ দেয়, যে ব্যক্তি দ্বিতীয় বিয়ে করে তার জন্য পুরোপুরি সমতা ও ন্যায় বিচারের সাথে আচরণ করা অবশ্য করণীয়। আর সব স্ত্রীদের মধ্যে নিজের সময়, সম্পদ এবং নিজের বাহ্যিক মনোযোগ এরূপভাবে বন্টন করে যে যেন বিচারের পাল্লা সমান হয়। আজকাল অনেক লোক দ্বিতীয় বিয়ের পরে প্রথম স্ত্রীকে ঝুলন্ত রেখে দেয়। যাকে প্রকৃতপক্ষে খান্দানের বৌ হিসাবে গণ্য করা হয় না আর তাকে অন্য পথ গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয় না। হাদীসে আছে, এসব লোক হাশরের ময়দানে এরূপভাবে উঠবে যে, তাদের অর্ধেক দেহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

(৮) মা বাবার খেদমতের ব্যাপারে উদাসীনতাপূর্ণ আচরণ করাও এ যুগের এক সাধারণ দুর্বলতা। বিশেষত বিয়ের পরে কোন কোন যুবক নিজের মা বাবার খেদমত তথা তাদের অবশ্য-করণীয় সম্মান করতেও দুর্বলতা দেখায়। যদিও (সত্য ধর্ম) শিরকের পর পিতামাতার হক আদায় না করাকে দ্বিতীয় নম্বরের পাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কুরআন মজীদ কি সুন্দর দোয়া শিখিয়েছে "রব্বির হাম্‌হুমা কামা রব্বায়ানী সগীরা" অর্থাৎ হে খোদা! তুমি আমার মা বাবার ওপর সেরূপ রহম কর যেরূপ তাঁরা আমার শিশুকালে আমাকে রহম ও স্নেহের সাথে লালন-পালন করেছে। এ দোয়াতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে, যেমনভাবে তোমাদের মা বাবা তোমাদের দুর্বল সময়ে পালকের নীচে রেখে লালন পালন করেছেন সেরূপভাবে এদের বার্ধক্যে তোমরা তাঁদের নিজেদের পালকের নীচে রাখ।

(৯) পুরুষদের জন্য বিশেষ আদেশ আছে, তারা যেন নিজেদের স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করে। আঁ হযরত (সঃ) বলেন, "খায়রুকুম খায়রুকুম লে আহলিহী–তোমাদের মধ্যে খোদার কাছে সবচেয়ে ভাল সে ব্যক্তি যে নিজের স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উত্তম। আর স্ত্রীদের জন্য এ আদেশ আছে যে, তারা যেন নিজেদের স্বামীর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত এবং সেবাকারী হয়। এমনকি আঁ হযরত (সঃ) বলেন, যদি খোদা ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করা জায়েয হতো তবে আমি আদেশ দিতাম, স্ত্রীরা তাদের স্বামীকে সিজদা করবে। এটি সাধারণ কথা নয়। বস্তুত সামাজিক মঙ্গল ও ব্যক্তিগত শান্তির জন্য ইহা মেরুদন্ডের হাড়ের মত।

(১০) **পড়শীদের সাথে ভাল ব্যবহারের জন্য** (সত্য ধর্মে) বিশেষ আদেশ আছে। আঁ হযরত (সঃ) বলেন, জিব্রাঈল (আঃ) পড়শীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার তাগিদ এরূপভাবে বার বার করেন যে, আমার মনে হচ্ছিল, সম্ভবত প্রতিবেশীদের মানুষের জন্য ওয়ারিশ করে দেয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ এ ব্যবহার থেকেই পাওয়া যায় যা সে তার নিজের প্রতিবেশীদের সাথে করে। অবশ্যই পড়শীর সাথে খারাপ ব্যবহার একটি বড় পাপ।

(১১) জামাতের ব্যবস্থপনা অনুসারে নিজেদের স্থানীয় আমীরের সাথে নেতিবাচক সহযোগিতা ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার অভ্যাসও বড় পাপের অন্যতম। এ কেবলমাত্র জামাতের শৃঙ্খলা নষ্ট করে না বরং জামাতের বদনামের কারণ হয়। জামাতের প্রভাব ধ্বংস করে এবং জামাতকে একতার বরকত থেকে বঞ্চিত করে। আঁ হযরত (সঃ) এদের সম্পর্কে তাকিদ করেন এবং বার বার বলেন, যদি তোমাদের ধারণায় তোমাদের কোন আমীর নিজের হক তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয় কিন্তু তোমাদের হক তোমাদের দিতে প্রস্তুত নয় তবুও তোমরা তার আনুগত্য করো আর নিজের অধিকারের জন্য খোদার প্রতি ভরসা কর। আরও বলেন, "মান সাজ্জা সাজ্জা ফিন্নার" অর্থাৎ যে ব্যক্তি জামাতে বিভক্তি সৃষ্টি করে তাকে আগুনে ফেলা হবে।

(১২) বর্তমান সময়ে ধুমপান এক আন্তর্জাতিক দুর্বলতায় পরিণতি লাভ করেছে। আর সম্ভবতঃ আমাদের জামাতের অনেকের মধ্যে এ দুর্বলতা পাওয়া যাবে। এ নেশায় মুখের দুর্গন্ধ, টাকার ক্ষতি, সময় নষ্ট এবং ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের দাওয়াত দেয়া ছাড়া আর কোন উপকার নেই। কোন কোন দার্শনিকের মতে এতে শরীরের সাময়িক প্রশান্তি আসে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আমার এ বস্তুর প্রতি প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণা আছে। যদি আঁ হযরত (সঃ)-এর সময়ে তামাকের প্রচলন হত তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি তা নিষিদ্ধ করতেন। সুতরাং বন্ধুদের এটি ত্যাগ করার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছি। যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে ছেড়ে দেয়া সম্ভব না হয় তবে কমপক্ষে এটুকু সাবধানতা অবলম্বন করা যায় যে, অন্যের সামনে তামাক সেবন থেকে বিরত থাকা। যেন এ দুর্বলতা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর তাদের সন্তান-সন্ততি অথবা অন্য আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবের মধ্যে এর বিস্তার না ঘটে।

(১৩) এ যুগে সিনেমা দেখার অভ্যাস এক মহামারী আকার ধারণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ধ্বংস করছে। আর খারাপ, অপবিত্র এবং লজ্জাকর ফিল্ম আর চরিত্রের বিরোধী দৃশ্যাবলী দেখার ফলে তাদের মন ও মস্তিষ্কে যেন ঘূণে ধরেছে। সিনেমার অপবিত্র আকর্ষণ অপরিণত স্বভাবের যুবকদের নানারূপ অপরাধের দিকে আকর্ষণ করছে। আমাদের জামাতে সিনেমা দেখা নিষেধ। কিন্তু শোনা যায় যে, কিছু অপরিপক্ক আহমদী কখনও কখনও এ দুর্বলতার শিকার হয়। যদি কোন জ্ঞানের, চিকিৎসার, পরিবেশের কিংবা যুদ্ধের ফিল্ম যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খারাপ দৃশ্যাবলী থেকে মুক্ত হয় তাহলে লোকেরা এ থেকে লাভবান হতে পারে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যে সব ফিল্ম বাহ্যিকভাবে ভাল মনে হয় তার মধ্যেও দুধের সাথে গোমূত্রের মিশ্রণ থাকে। সুতরাং সব সময় এসব থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

এখানে কিছু দুর্বলতা আমি কেবলমাত্র উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছি। যদিও অসংখ্য দুর্বলতা আছে। যেমন কুদৃষ্টি, গীবত, গালাগালি করার অভ্যাস, বাজে কথা বলা, খারাপ পত্রিকা পড়া, বিনা কাজে সময় কাটান ইত্যাদি। প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষণ করে নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে, যদি তিনি সব খারাপ কাজকে না ত্যাগ করতে পারেন তবে কমপক্ষে কিছু পাপকে অবশ্যই প্রথমে পরিহার করবেন। আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র ইচ্ছা অনুসারে জামাতের বন্ধুদের কাছে আবেদন করছি যে, তারা যেন এ রমযান মাসে নিজেদের কোন না কোন দুর্বলতাকে সামনে রেখে তা ত্যাগ করার অঙ্গীকার করেন। আর খোদার কাছে সাহায্য চেয়ে ও পাপ থেকে এরূপভাবে পৃথক থাকেন যেরূপ মু'মিন সাহেবানদের রীতি। রমযান যেন তাদের কাছে পরিপূর্ণ এবং স্থিরীকৃত প্রতিদানকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়। যেমন আমি বলেছি, এ অঙ্গীকারকে কারো কাছে প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। কারণ আমার খোদা 'সাত্তার' আর ত্রুটিকে গোপন করা পসন্দ করেন। কিন্তু বিস্তারিত প্রকাশ না করে বুযূর্গ ও বন্ধুদের কাছে দোয়ার আবেদন করার কোন ক্ষতি নেই। কারণ মু'মিনরা একে অপরের জন্য সাহায্যকারী হয়।

**ওমান্‌নাসরু ইল্লা মিন ইন্দিল্লাহি ওয়া আলাল্লাহি ফালইয়া তাওক্কালিল মু'মিনুন**-খাকসার নিজের দুর্বলতা ও অলসতার জন্য বন্ধুদের কাছে একনিষ্ঠভাবে দোয়াপ্রার্থী। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীম। ওয়া আখেরুদাওয়ানা আনিল্ হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

অনুবাদ - কওসার আলী মোল্লা

# রমযান ও ইতি'কাফ

রমযান শব্দটি 'রম্য' মূল ধাতু হতে সৃষ্ট। এর আভিধানিক অর্থ পিপাসায় উত্তপ্ত হওয়া। পবিত্র রমযান মাসে প্রতিটি সুস্থ সবল সাবালক নর-নারীর জন্য সিয়াম সাধনাতে ব্রতী হওয়া ফরয। রমযানের তাৎপর্য সম্বন্ধে হযরত মাওউদ (আঃ) বলেন যে, আরবী ভাষাতে সূর্যের তাপকে রময বলা হয়। যেহেতু রমযান মাসে রোযাদারগণ পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক কামনা-বাসনা হতে বিরত থাকেন এবং আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালনের প্রতিজ্ঞায় নিজের প্রাণে ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, সে জন্যে এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযান হয়েছে। (আল্ হাকাম ২৪শে জুলাই, ১৯০৯ইং)

'সিয়াম' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষাতে সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার পানাহার এবং যৌনাচার হতে বিরত থাকাকে সিয়াম বা রোযা বলা হয়। ই'তিকাফের শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা। ইসলামী পরিভাষায় নিয়্যত করে জামে মসজিদে অবস্থান করে খোদাতাআলার রেজামন্দি হাসিলের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ই'তিকাফ বলা হয়। ইসলামের পূর্বেও মানুষ সিয়াম সাধনা বা রোযা পালন করত। হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) পর্যন্ত সকল নবীই রোযা পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। ইসলামের পূর্বে রোযার অস্তিত্ব বিদ্যমান। সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো; যেভাবে উহা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদিগের উপর যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার" (সূরাতুল বাকারা ঃ ১৮৪ আয়াত)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হুযূর পাক (সঃ) মদীনাতে আগমন করে দেখতে পেলেন, ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা পালন করে থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এদিনে রোযা পালনের কারণ কি? ইহুদীরা বলল, এটি তাদের জন্য অতি উত্তম একটি দিন। কেননা এদিনটিতেই আল্লাহ্‌তাআলা ফেরাউনের নির্যাতন হতে বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার করেছিলেন। তাই হযরত মূসা (আঃ) এদিনে রোযা রাখতেন "এ কথা শ্রবণ করে হুযূর (সঃ) বললেন, আমি তোমাদের অপেক্ষা হযরত মূসাকে বেশি শ্রদ্ধা করি। এরপর তিনি এদিনের রোযা নিজে পালন করেন এবং অপরকে পালন করতে বলেন" (দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম)। নবীগণের রোযার মধ্যে ইসলামী ফরয রোযা ব্যতীত, হযরত দাউদ (আঃ)-এর রোযা হুযূর (সঃ)-এর নিকট বেশি পসন্দনীয় ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর পাক (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সব সময় রোযা রাখ আর রাত ভর নফল নামায আদায় কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। হুযূর (সঃ) বললেন, এমনটি করলে তোমার চোখ বসে যাবে। এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। মনে রাখবে যে ব্যক্তি সমস্ত বছর রোযা রাখল সে যেন রোযাই রাখল না। আর যে ব্যক্তি মাসে তিনদিন করে (নফল) রোযা রাখে সে যেন সমস্ত বছরই রোযা রাখল। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য রাখি। তখন হুযূর (সঃ) বললেন, তবে তুমি সাওমে দাউদ পালন কর। প্রশ্ন করলাম, "সাওমে দাউদ কী"? হুযূর বললেন, হযরত দাউদ (আঃ) একদিন রোযা পালন করতেন আর একদিন ছেড়ে দিতেন। এবং যখন তিনি শত্রুর সম্মুখীন হতেন তখন পলায়ন করতেন (সূত্র দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম)। যাত্রা পুস্তক ৩৪/২৮ পদে বর্ণিত রয়েছে, "সেই সময় মূসা চল্লিশ দিবারাত্র সেস্থলে সদাপ্রভুর সহিত অবস্থান করলেন। অন্নভোজ ও পানাহার হতে বিরত রইলেন আর তিনি সেই দুই প্রান্তরে নিয়মের বাক্যগুলো, অর্থাৎ দশ আজ্ঞা লাভ করলেন।"

বাইবেল মথি ৪ঃ২-৩ পদে বর্ণিত রয়েছে, "তখন যীশু দিবাসয় (শয়তান) দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্য আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হলেন। আর তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থেকে শেষে ক্ষুধিত হলেন।"

উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্মের পূর্বেও রোযার প্রচলন ছিল। কিন্তু তখন উহার জন্য নির্ধারিত কোন মাস এবং সুস্পষ্ট কোন বিধি-বিধান বিদ্যমান ছিল না। ইসলাম ধর্মে সিয়াম বা রোযা পালনের জন্য আরবী মাস রমযানকে নির্দিষ্ট করে সুস্পষ্ট নিয়ম-কানুন আরোপ করা হয়েছে। সূরাতুল বাকারা ১৮৬ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ "রমযান সেই মাস যে মাসে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানব সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়াতস্বরূপ। এবং হেদায়াত ও ফুরকান বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে। কিন্তু যে রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তবে অন্য সময়ে গণনা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর। এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করো। এজন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত প্রদান করেছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" প্রত্যেক মুসলমানকে মনে রাখতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই সুস্থ-সবল সাবালক নর-নারীর জন্য পবিত্র রমযানের রোযা পরিত্যাগ করার উপায় নেই। যদি অসুস্থ ও সফরজনিত করাণে রোযা ছুটে যায় তবুও উহা পরবর্তী সময়ে আদায় করতে হবে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। হুযূর (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রমযান মাসের একদিন কোন প্রকার ওজর বা অসুস্থতা ব্যতীত রোযা পরিত্যাগ করবে, সে ঐ একদিন রোযা পরিত্যাগের ক্ষতি এক যুগ রোযা রেখেও পুরণ করতে পারবে না (বুখারী)। কুরআনুল করীমে রযমান মাসে সকল অবস্থায় রোযা পালনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র নির্দেশে মুকীম অবস্থায় রোযা আদায় করা যেমন পুণ্যের কাজ, তদ্রূপ মুসাফীরি অবস্থায় রোযা না রাখাটাও পুণ্যের কাজ। তবে মুসাফীরি অবস্থায় ভাঙ্গতি রোযা রমযানের অবশ্যই পরে আদায় করতে হবে।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হুযূর পাক (সঃ) সফরে ছিলেন। এমতাবস্থায় এক স্থানে দেখতে পেলেন লোকজনের ভীড় এবং সে স্থলে এক লোকের উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হুযূর (সঃ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কী করা হচ্ছে? সবাই আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্

(সঃ) এক রোযাদার ব্যক্তি বেহুশ হয়েছে একথা শুনে হুযূর (সঃ) বললেন, "সফর অবস্থায় রোযা রাখাতে কোন পুণ্য নেই।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একবার রমযানে হুযূর (সঃ) মক্কা হতে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি রোযা ছিলেন, যখন উছফান নামক স্থানে উপস্থিত হলেন, হুযূর (সঃ) তখন পানি আনার আদেশ করলেন। এবং সবাইকে দেখিয়ে পানি পান করলেন। মক্কাতে ফিরে না আসা পর্যন্ত হুযূর (সঃ) আর রোযা রাখেন নি।"

রোযা পালন অবস্থায় যাবতীয় আহার-বিহার হতে যেরূপে বিরত থাকতে হয়, তদ্রুপ পরনিন্দা,পরচর্চা, মিথ্যা, গীবত, সমালোচনা এবং অশ্লীল কথাবার্তা ও চাল-চলন হতেও নিজেকে পরহেয করতে হয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন, হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় মিথ্যা কথা আর অপকর্ম পরিহার করে না সে ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগের মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নেই" (বুখারী)। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) অপর এক রেওয়ায়াতে বলেন, হুযূর (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন অশ্লীল কথাবার্তায় ও অপকর্মে লিপ্ত না হয়। যদি কেউ তার সাথে মারামারি ও তাকে গালিগালাজ করতে আসে, তখন সে যেন বলে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার" (বুখারী)।

মাহে রমযানের রোযা মানুষকে পাপ পরিহার করে সিরাতাল মুসতাকীমে প্রতিষ্ঠিত হবার পথকে সুগম করে দেয়। রোযার দ্বারা মানুষ স্বীয় নেক আমলগুলোকে যথোপযুক্ত আবরণ দ্বারা সুরক্ষা করতে সক্ষম হয়। কেননা হাদীসে রোযাকে যুদ্ধ ময়দানে শত্রু সৈন্যের আক্রমণ হতে স্বীয় দেহের হেফাযতের জন্য ব্যবহারকারী ঢালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। রোযার প্রতিদানের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে হুযূর (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন, আদম সন্তান প্রতিটি কাজই করেন নিজের জন্য, কেবল মাত্র রোযাটিই করেন আমার জন্য এবং উহার প্রতিদান আমি নিজে দান করব" (বুখারী)। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযূর (সঃ) বলেছেন, "যখন রমযান মাস আরম্ভ হয়ে যায়. তখন উর্দ্ধ হতে রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। এবং শয়তানগুলোর পায়ে শিকল পড়ানো হয়" (বুখারী)। রমযানে আল্লাহ্র ফিরিশ্তা আহ্বান করতে থাকে এই বলে যে, "হে সত্যের সন্ধানী সুপথের পথিক! দ্রুতগতিতে সামনে অগ্রসর হও এবং উন্নতি লাভ কর। আর হে কু-পথের পথিক! ক্ষান্ত হও, সাবধান হও, অবহেলায় সুযোগ নষ্ট করবে না"। রোযাদার ব্যক্তিগণের জান্নাতে প্রবেশ লাভ করা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হুযূর পাক (সঃ) বলেন, "জান্নাতের একটি দরজার নাম হলো 'রাইয়্যান' ঐ দরজা দিয়ে কেবল তারাই প্রবেশ করবে যারা রোযাদার। রোযাদারগণের প্রবেশান্তে ঐ দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে" (বুখারী)। রমযানের রোযার হকীকত সম্বন্ধে খোদার হাবীব, আমাদের আকা ও মৌলা খাতামুল আম্বিয়া সৈয়্যদুল মুরসালীন মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) বলেন, 'যে কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের আশাতে একদিন রোযা পালন করল, আল্লাহ্ তার নিকট হতে জাহান্নামকে এতদূরে সরিয়ে রাখবেন যে, যতদূর একটি কাক অতিবৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে" (আহমদ বাইহাকী)।

রমযান মাসে শেষ রাতে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে সেহেরী খেতে হয়। হযরত আমর ইব্নুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযূর (সঃ) বলেছেন, "আমাদের এবং ইহুদী নাসারাদের রোযার পার্থক্য হলো সেহেরী খাওয়া" (আবূ দাউদ)। অপর এক রেওয়ায়াতে সেহেরীকে কল্যাণময় খাবার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেহেরী খাওয়ার সময় সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন করীমায় বর্ণিত হয়েছে "এবং তোমরা আহার এবং পান কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উপর শুভ্র রেখা কৃষ্ণ রেখা হতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়।" হুযূর (সঃ) সেহেরী ও সময় সম্বন্ধে বলেন, তোমরা খাও এবং পান কর এবং তোমাদের যেন সুবেহ্ সাদিকের উচ্চ লম্বা রেখা সেহেরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে। এবং তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার কর। যতক্ষণ না সুবেহ্ সাদিকের লম্বা লাল আলোকের রশ্মি প্রকাশিত হয়" (আবূ দাউদ)। অনেকেই বলে থাকেন, ফজরের আযান কর্ণে প্রবেশ মাত্র সেহরী খাওয়া বন্ধ করা ঠিক নয়। কেননা হুযূর (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আযান শ্রবণ করে, যদি হাতে খাবারের পাত্র থাকে, এমতাবস্থায় সে যেন আযানের কারণে খাদ্য গ্রহণ হতে বিরত না হয়। যতক্ষণ না সে উহা দ্বারা স্বীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে।" রোযা রাখার জন্য মুখের উচ্চারণে কোন নিয়্যত করার প্রয়োজন নেই। সুবেহ সাদিকের পর হতে সর্ব প্রকার পানাহার ও প্রজনন কাম হতে বিরত থাকাই নিয়্যত বলে পরিগণিত হবে।

রমযানে রোযান্তে ইফতার সম্বন্ধে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযূর (সঃ) বলেছেন, যারা রোযা পালন করে তাদের জন্য আনন্দ উপভোগের দু'টি সুযোগ রয়েছে। প্রথমটি হলো ইফতারের সময় আর দ্বিতীয়টি হলো যখন সে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হবে। তখন রোযার কারণে সে আনন্দিত হবে" (বুখারী)। মহা আনন্দময় এ ইফতারের সময় সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন করীমায় বলা হয়েছে, "অতঃপর তোমরা রাত্রির শুভাগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর" (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১৮৪)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হুযূর (সঃ) বলেছেন, ধর্ম ততদিন পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা জলদি-জলদি ইফতার করবে। কেননা ইহুদী নাসারারা বিলম্বে ইফতার করে থাকে (আবূ দাউদ)। হযরত মুয়ায ইবনে যুহরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর (সঃ) ইফতারের সময় খেজুর অথবা পানির সাহায্যে রোযা খুলতেন। এবং দোয়া করতেন, আল্লাহুমা লাকা সুমতু ওয়াআলা রিযক্বিকা আফতারতু" (আবূ দাউদ)। হে আল্লাহ্! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই রিজিক দ্বারা ইফতার করছি।

পবিত্র রমযানে হাজার মাস অপেক্ষা মহামর্যাদাবান, বরকতময়, সৌভাগ্যের চাবিকাঠি নামে একটি রজনী রয়েছে। পবিত্র কুরআনুল করীমে এ মহা সম্মানিত রজনী সম্বন্ধে ব্যক্ত হয়েছে, "নিশ্চয় আমরা ইহাকে (কুরআনকে) লায়লাতুল ক্বদরে নাযিল করেছি। এর [হে মুহাম্মদ (সঃ)] তোমাকে কিসে অবহিত করবে যে, 'লায়লাতুল ক্বদর কী? "লায়লাতুল ক্বদর হলো হাজার মাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। এ রাতে ফিরিশ্তাগণ এবং কামেল রূহ তাদের প্রতিপালকের হুকুম অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়সহ নাযিল হয়। (এ সময়ে) পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজমান থাকে যে পর্যন্ত না ফজরের উদয় হয়" (সুরাতুল ক্বদর)।

উল্লেখিত সূরাতে লায়লাতুল ক্বদর সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ ও সময়ের উল্লেখ নেই।

হাদীসাবলী হতে এ বিষয়ে যতটা তথ্য পাওয়া যায় তা হলো ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। হুযূর (সঃ)-এর কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম স্বপ্নযোগে লায়লাতুল ক্বদরকে রমাযানে শেষ সাত দিনের মধ্যে দেখেছেন বলে ব্যক্ত করলে, হুযূর (সঃ) বললেন, "তোমাদের স্বপ্নে এ বিষয়ে একই বর্ণনা দেখছি যে, লায়লাতুল ক্বদর রমযানের শেষ সাত দিনে বিদ্যমান। অতএব যারা ঐ রাতের অভিলাষি তারা যেন উহাকে রমযানের শেষ সপ্তম দিনেই তালাস করেন (বুখারী)। অপর দিকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হুযূর (সঃ) বলেছেন, "তোমরা লায়লাতুল ক্বদরকে রমযানের শেষ দশদিনের বেজোড় রজনীসমূহে অনুন্ধান কর (বুখারী)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুযূর (সঃ) বলেছেন, তোমরা লায়লাতুল ক্বদরকে রমযানের শেষ দশদিনে অনুসন্ধান কর। অর্থাৎ একুশ, তেইশ , পঁচিশে, সাতাশ ও উনত্রিশ রমযানে (বুখারী)। উপরোল্লেখিত হাদীসাবলীর আলোকে রমযান মাসের শেষ দশক যা রহমতের অধ্যায় হিসাবে পরিচিত সে সময়গুলোতেই লায়লাতুল ক্বদরের অনুসন্ধানে রত থাকা আবশ্যক।

রোযার আত্মিক সুফলকে পূর্ণতার দিকে পৌঁছাতে লায়লাতুল ক্বদরের অনুসন্ধানে রমযানের শেষ দশকে দিবা-রাত্র যে বিরামহীন চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো হয় উহাকেই ই'তিকাফ বলে। ই'তিকাফ সম্বন্ধে আল্লাহ্তাআলা বলেন, "এবং তোমরা মসজিদসমূহে যখন ই'তিকাফে থাক। তখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র সীমাসমূহ। অতএব তোমরা এর নিকটেও যাবে না। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশনাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। যেন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে (সূরাতুল বাকারা ঃ ১৮৮)।

রমযানের সাধনাকে চূড়ান্ত মার্গে উপনীত করার মানসিকতা নিয়ে খোদাতাআলার রেজামন্দি হাসিল করতে প্রত্যেক সুস্থ-সবল মুসলমানের উচিত দিনের ন্যায় রাতেও স্বামী স্ত্রীর মিলন হতে বিরত থেকে ইবাদত বন্দিগী ইস্তিগফার ও দুরূদ শরীফ ও কুরআন পাঠের মাধ্যমে রূহানিয়তকে এমন পর্যায়ে উপনীত করা, যে স্থানে উপনীত হবার ফলে বান্দার ডাকে আল্লাহ্তাআলা সাড়া দিয়ে থাকেন। কেননা কুরআন করীমে রমযানের যাবতীয় কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণের পরেই ব্যক্ত হয়েছে, "এবং আমার বান্দা যখন তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তখন বল, আমি নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর প্রদান করে থাকি। যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে থাকে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া প্রদান করে এবং আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে যাতে তারা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে (সূরাতুল বাকারা ১৮৭)।

ই'তিকাফ সম্বন্ধে কিছু নিয়ম-কানুন সম্বন্ধীয় হাদীস উপস্থাপন করে প্রবন্ধের ইতি টানছি। ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে কখন মসজিদে গমন করতে হবে, "হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর (সঃ) যখন ই'তিকাফের ইরাদা করতেন তখন তিনি ফজরের নামায আদায়ের পর ই'তিকাফকারী হিসাবে মসজিদে প্রবেশ করতেন (আবূ দাউদ)। ই'তিকাফ অবস্থায় ই'তিকাফকারীর সাথে দেখা করা ও ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদের বাইরে গমন করা সম্বন্ধে নিম্নের হাদীস দু'টি প্রণিধানযোগ্য। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলে মকবুল (সঃ) যখন ই'তিকাফ করতেন, তখন তিনি স্বীয় মাথা মোবারক মসজিদ হতে আমার নিকটবর্তী করতেন। আর আমি তাতে চিরুনী করে দিতাম। আর তিনি পেশাব পায়খানার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে গৃহে প্রবেশ করতেন না" (আবূ দাউদ)। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হুযূর (সঃ) ই'তিকাফে অবস্থান রত অবস্থায় আমি তাঁর সাতে দেখা করি এবং প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলি। অতপর আমি আমার গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য উঠে দাঁড়াই, তখন হুযূর (সঃ) ও আমার সাথে উঠে দাঁড়ান। যাতে তিনি আমাকে আমার গৃহে পৌঁছে দিতে পারেন। তখন তাঁর আবাসস্থল ছিল হযরত যায়েদের গৃহে। ঐ সময় আনসারগণের দুই জন কোথাও যাচ্ছিলেন। তাঁরা হুযূর পাক (সঃ) এর সাথে একজন মহিলাকে লক্ষ্য করে দ্রুতগতিতে চলতে থাকেন। হুযূর (সঃ) তাঁদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা স্বাভাবিকভাবে যাও। আর এ হলো সাফিয়া। তাঁরা অবাক হয়ে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ)! সুবহানাল্লাহ্। তিনি বললেন, শয়তান রক্ত প্রবাহে মানুষের ধমনী দিয়ে চলাচল করে। আর আমার আশংকা যে, হয়ত তোমরা কোন সন্দেহপোষণ করতে পার (আবূ দাউদ)। জামে মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ পরিশুদ্ধ হয় না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযূর (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, "ই'তিকাফ-কারীর জন্য সুন্নত এই যে, সে যেন কোন রোগীর সেবার জন্য গমন না করে। জানাযার নামাযে শরীক না হয়। স্ত্রীকে স্পর্শ না করে। এবং সে যেন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ হতে বের না হয়। রোযা ব্যতীত ই'তিকাফ নেই এবং জামে' মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ পরিশুদ্ধ হয় না।" (আবূ দাউদ)।

ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে মসজিদে তাবু বানানো বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযূর (সঃ) রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। এবং আমি তাঁর জন্য মসজিদে তাবুর ন্যায় একটি ঘেরাও বানাতাম। উহা থাকত ছোট্ট। তিনি ফজরান্তে ঐ ঘেরার ভিতরে প্রবেশ করতেন। একবার আমি আমার জন্য ই'তিকাফের অনুমতি চাইলে, তিনি অনুমতি দিলেন। তখন আমি নিজের জন্যেও পৃথক একটি তাবু বানালাম। এরপর হাফসা এবং জয়নাব (রাঃ)ও অনুমতি নিয়ে তাবু বানালো। হুযূর (সঃ) ফজরের নামাযে উপস্থিত হয়ে নামাযীদের অসুবিধা লক্ষ্য করে এক এক করে সমস্ত তাবু ভেঙ্গে ফেললেন। তারা নেকী হাসিল করতে চায়? এ বলে তিনি নিজেও ই'তিকাফ হতে বিরত রইলেন"(বুখারী)। ই'তিকাফকরত অবস্থায় পঠিত দোয়া ঃ

"হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার ই'তিকাফের নিয়্যত করে হুযূর (সঃ)-এর নিকট আরজ করলাম। হে আল্লাহ্র রসূল (সঃ) আমি ই'তিকাফে কি দোয়া করব? হুযূর (সঃ) বললেন, তুমি দোয়া করবে ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুবুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী-(বুখারী)। হে আল্লাহ্! তুমি অবশ্যই মূর্তিমান ক্ষমা। তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা কর"।

**- মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম**
মোয়াল্লেম

# রোযার মাহাত্ম্য

আল্লাহ্ বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের উপর রোযাকে ফরয করা হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা ফরয করা হয়েছিল। যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার" (সূরাতুল বাকারা ঃ ১৮৪)। খোদাতাআলার এ কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিশ্বের সকল ধর্মেই রোযার নির্দেশ ছিল এবং আছে। সকল ধর্মের লোকেরাই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস মতে রোযা পালন করেও থাকেন। আমরা যারা প্রকৃত মুসলমান তারা তো রমযান মাসের সব রোযাই রাখি। শুধু রোযা রাখলাম সারাদিন না খেয়ে কোন নিয়ম নীতি মানলাম না তা হলে কি প্রকৃত রোযার যে কল্যাণ রয়েছে তা লাভ করতে পারব, অবশ্যই না।

শুধু মাত্র সারাদিন অনাহারে থাকার নাম রোযা নয়। পানাহার, যৌন সম্পর্ক, পরনিন্দা, পরসম্পদ হরণ বা অপহরণ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি একজনের পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাকে যত প্রকার অন্যায় ও মন্দের দিকে ধাবিত করতে পারে সে সব হতে মুক্ত হয়ে এক মাত্র খোদা-নির্দেশিত পথে চলে নিজেকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র পরিমন্ডলে বিরাজমান রাখার নামই রোযা পালন।

হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান সহকারে ও সওয়াব লাভের প্রত্যাশায় রমযানের রোযা রাখে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়" (বুখারী ও মুসলিম)। প্রিয় মুসলমান ভাই-বোনেরা এ হাদীসটির উপর ভাল করে লক্ষ্য করুন এবং নিজে নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন, আমি কি এ রোযা কেবল আল্লাহ্কে পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাখছি না লোক দেখানোর জন্য রাখছি? যদি আমরা কেবল খোদার সন্তুষ্টির জন্যই এ রোযা রাখি তা হলে আমাদেরকে সেভাবেই রাখতে হবে যেভাবে ইসলাম শিক্ষা দেয়। এখানে রসূল করীম (সঃ) বলছেন, পূর্ণ ঈমানের সাথে রোযা রাখার জন্য আর এভাবে রাখলে খোদা আমাদের পূর্বের সব গুনাহ্ ক্ষমা করে দিতেও প্রস্তুত। তা হলে চিন্তা করা দরকার কোন্ হৃদয় নিয়ে রোযা রাখতে হবে আমাদের।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "সর্বদা রোযাদারের এ কথা দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, ক্ষুধার্ত থাকাই তার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উচিত সে খোদাতাআলার যিক্র এ মগ্ন থাকবে যাতে দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্মুখী হওয়া যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য এটিই যে, মানুষ একটি রুটি ছেড়ে দিয়ে যা কেবল দেহ প্রতিপালন করে, দ্বিতীয় রুটি লাভ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ। যারা কেবল খোদার জন্য রোযা রাখে এবং নিছক রুসূম হিসাবে রাখে না, তাদের উচিত আল্লাহ্তাআলা 'হামদ' (প্রশংসা), তসবীহ্ (গুণ কীর্তন করা) ও 'তাহ্লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) পাঠে মগ্ন থাকা যদ্দরুন অন্য খাদ্যও তারা পেয়ে যাবে" (মলফূযাত, নবম খন্ড পৃঃ ১২৩ প্রকাশিত পাক্ষিক আহমদী, ১৯৯৯ জানুয়ারী)।

যারা রোযা রাখে কিন্তু অন্তরে খোদার ভয় নেই তাদের জন্য এ রোযা কেবল কষ্টের কারণ। দুর্ভাগ্য সেই সব ব্যক্তির জন্য যারা কেবল দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আত্মিক খাদ্যের কোন পরোয়াই করে না। তারা তো দুনিয়ার জন্য আগাছা সদৃশ। দেহের খাদ্য জমি হতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আত্মার খাদ্য ইলাহী স্মরণ, যিক্র, হামদ, নামায, তিলাওয়াতে কুরআন, সদাচরণ ইত্যাদি হতে উৎপন্ন হয়। অতএব রোযাই সর্বোত্তম মাধ্যম যা আত্মাকে সঞ্জীবিত করতে সক্ষম, শক্তিশালী করতে সক্ষম। জড় খাদ্য ও ভোগ বিলাসে মত্ত মৃত বা মৃতপ্রায় আত্মাকে জীবন্ত বা জাগরিত করতে রোযা বা উপবাসব্রতসহ বর্দ্ধিত আকারে যিক্রে ইলাহীর কোন বিকল্প নেই।

এ রমযান মাসের এত মাহাত্ম্য যার সম্পর্কে খোদাতাআলা বলছেন ঃ রমযান সে মাস যাতে কুরআন নাযেল করা হয়েছে যা মানব জাতির জন্য হোদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকানের (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারীর) জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায় সে যেন এতে রোযা রাখে; কিন্তু যে রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করতে হবে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না এবং তোমরা যেন গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন কর এ জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর" (সূরাতুল বাকারা ঃ ১৮৬)।

এ আয়াতটিতে যা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখুন প্রতিটি সুস্থ মানুষের জন্য এ রমযানের রোযা ফরয করেছেন। আমরা সবাই জানি খোদার কোন কথা কে অমান্য করলে সে আর ইসলামের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে না। তাহলে কেন আমরা এ নেকীর মাস থেকে এবং এর মাহাত্ম্য ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকব? আমাদের রোযা যদি প্রকৃত রোযা হয়ে থাকে তাহলে খোদা এত সন্তুষ্ট হোন যেভাবে রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ বলেন- প্রত্যেক নেকীর জন্য বস্তুর আকারে আমি কোন না কোন পুরস্কার নির্ধারিত করেছি। কিন্তু রোযার পুরস্কার আমি নিজেই।" আল্লাহ্কে পেয়ে গেলে মানুষের জন্য কি আর কোন পার্থিব চাহিদা থাকতে পারে? যে খোদাকে লাভ করেছে সে তো সবই লাভ করে ফেললো। আমাদের সবার তো উদ্দেশ্যে হলো খোদাকে লাভ করা আর খোদাকে পেতে হলে খোদার কথা মত চলতে হবে এটা তো সবাই জানি। তা হলে কেন আমরা এভাবে চলি না?

দিন মজুরদের জন্যে রোযা ঃ

কতক দিনমজুর রোযা রাখতে কষ্ট মনে করে থাকে তারা কী এ কারণে রোযা পরিত্যাগ করতে পারে? রোযা রাখতে কারও কষ্ট হয় না। কুরআন মজীদ এ কারণেই উল্লেখ করে নি আর হাদীসসমূহে এর কোন ব্যাখ্যা নেই যদিও দিন মজুর তখনও ছিলো। অবশ্য যদি দুর্বলতা থাকে এবং রোযা রাখার সহ্য ক্ষমতা না থাকে তাহলে তা রুগ্ন সম্পর্কিত আদেশের আওতাধীন অথচ রুগীর ওপরে রোযা ফরয নয়। হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সামনে যখন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলো যে কখনও কখনও রমযান এমন ঋতুতে আসে যে, কৃষকদের কাজের খুব চাপ থাকে যেমন, মাঠে বীজ বপন করা, ফসল কাটা, এরূপে দিনমজুর যারা দিন মজুরী করে দিন কাটায় তারা সকলে রোযা রাখে না। তাই তাদের ব্যাপারে নির্দেশ কী? এর উত্তরে হযরত আকদস (আঃ) বলেন, **ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়্যত**। এসব লোক নিজেদের অবস্থা গোপন রাখে। প্রত্যেক ব্যক্তি খোদা-ভীতি ও পবিত্রতা সহকারে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করুক। যদি কেউ নিজের জায়গায় দিন মজুর রাখতে পারে তাহলে এমন করুক নচেৎ 'রুগী' সম্পর্কিত আদেশের আওতাধীন হবে, পরে সুবিধামত রেখে নিবে" (আল্ বদর, ২৬-৯-১৯০৭ইং)।

**ঋতুবতী, প্রসূতী বা স্তন্যপায়ী ও গর্ভবতী ঃ**

ঋতুবতী মহিলারা রোযা রাখতে পারে না। ঋতুবতীদের প্রথমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগে আমরা ঋতুর কারণে রোযা রাখতাম না। পরে আমাদের ঐ রোযাগুলো রাখার নির্দেশ প্রদান করা হলো (সুনানি ইবনে মাজাহ্)।

প্রসূতী এবং গর্ভবতী মহিলাদের সম্পর্কে হাদীসে এসেছে ঃ রসূল করীম (সঃ) বলেন, "আল্লাহ্তাআলা ভ্রমণকারীদের অর্ধেক নামায মাফ করে দিয়েছেন এবং গর্ভবতী ও প্রসূতী বা দুগ্ধ দানকারী মহিলাদের রোযা রাখা থেকে অবকাশ দিয়েছেন" (তিরমিযী)। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সঃ) গর্ভবতী

মহিলা এবং স্তন্যদায়িণী মহিলাদের রোযা থেকে অবকাশ দিয়েছেন (সুনানি ইবনে মাজাহ্) যদি কোন মহিলার এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যে, একবার প্রসূতী আবার অন্য সময়ে গর্ভবতী তাহলে তার ক্ষেত্রে রোযা মাফ এবং কেবল ফিদিয়া প্রদান যথেষ্ট।

**ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে রোযা ঃ** যে সব ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত তাদের জন্যে রোযা রাখার ব্যাপারে এ নির্দেশ যে, রোযা রাখার কারণে দৈনন্দিন ব্যস্ততা পরিত্যাগ করার আদেশ দেয়া হয় নি। এজন্যে দৈনন্দিন কাজ কর্মের কারণে যদি এক ব্যক্তি রোযার কষ্ট বরদাশ্ত করতে অপারগ হয় তাহলে সে রুগীর আদেশের আওতাধীন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার পদক্ষেপের জন্যে দাবী হবেন এবং তার সাথে তার নিয়্যত ও অবস্থানুযায়ী আল্লাহ্তাআলা ব্যবহার করবেন। মোটকথা নিজের অবস্থানুযায়ী সিদ্ধান্ত রোযার জন্যে মানুষ নিজেই মূর্খতা। যে ব্যক্তি রোযা রাখতে গিয়ে রুগ্ন হয়ে যায় যদিও সে ইতোপূর্বে রুগী ছিলো না তার জন্যে রোযা মাফ। যদি তার অবস্থা সর্বদাই এরকম থাকে তাহলে কখনও তার ওপরে রোযা অবশ্য করণীয় হবে না। যদি কোন ঋতুতে এমন অবস্থা হয় তা হলে অন্য সময়ে রোযা রেখে নিবে। অবশ্যই তাকওয়ার ভিত্তিতে কাজ করা উচিত। স্বয়ং নিজে চিন্তা করে নিবে কেবল বাহানা যেন না হয় সত্যিকারের ব্যাধি হয় (আল্ ফযল, ২২/৫/১৯২২ইং)।

**ফিদিয়া ঃ**

রমযানের রোযার ফিদিয়া দেয়া কেবল ঐসব সামর্থ্যবান লোকদের জন্যে যাদের ব্যাপারে এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে, খুব নিকটবর্তী সময়ে তারা ওগুলোর কাযা করতে পারবে। ভাঙতি রোযাগুলো (রেখে নেয়া) যেমন খুবই বৃদ্ধ যাদের শক্তি একেবারেই লোপ পেয়েছে বা কোন চিররুগী, বা গর্ভবতী বা প্রসূতি (স্তন্যদায়িনী মহিলা)। যদি এসব লোকের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় তাহলে প্রত্যেক রোযার বদলে এক ব্যক্তিকে দু' বেলা খাদ্য দেবে বা এর সম-পরিমাণ অর্থ জামাতে দিয়ে দেয়া আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন যে, আমি এর আগে কখনও রোযা রাখি নি, এর ফিদিয়া কী? এর ওপরে তিনি বলেন ঃ

"খোদাতাআলা কোন ব্যক্তিকে তাঁর সামর্থ্যের বাইরে রেখে দেন নি। সামর্থ্যানুযায়ী বিগত দিনের ফিদিয়া আদায় করে দাও। ভবিষ্যত্যের জন্যে অঙ্গীকার করো যে, সব রোযা রাখবো" (আল্ বদর, ১ম খন্ড, নম্বর ১২, ১৬১, ১৯০৩ইং পৃঃ ৯১)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ যেসব রুগীর ও ভ্রমণকারীর আশা নেই যে, কখনও রোযা রাখার সুযোগ আসবে যেমন এক বৃদ্ধ লোক বা একজন দুর্বল গর্ভবতী মহিলা যারা দেখে যে সন্তান জন্ম নেবার পরে সন্তানের দুধ পান করার কারণে তারা পুনরায় অপারগ হয়ে যাবে এবং সারা বছর এভাবে কাটাতে হবে এরূপ ব্যক্তিদের জন্যে ইহা সিদ্ধ হবে যে, তারা রোযা রাখবে না। কেন না, তারা রোযা রাখতেই পারে না এবং তারা ফিদিয়া দেবে' (সাপ্তাহিক আল্ ফযল ২৬/১২/৯৭ইং)।

আসুন আমরা রোযাকে আমাদের নিতান্ত আপনজন অপেক্ষাও আপন করে নেই। রোযার যথার্থ মর্যাদা রক্ষার তাগিদে জীবন পণ করে রোযাদার হয়ে যাই। কোন প্রকার বাহানা সৃষ্টি না করে একান্ত নিষ্ঠার সাথে রোযার মাসকে অতিবাহিত করি। খোদাতাআলা যেন আমাদেরকে এ রোযার মাসের ফযীলত বেশি বেশি দান করেন এই দোয়াই করা উচিত। খোদাতাআলা আমাদের সকলকে সুস্থ হতে ও প্রকৃত অর্থে রোযা পালন করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

**- মাহমুদ আহমদ সুমন**, মোয়াল্লেম

তথ্য সংগ্রহ
১। রিয়াদুস সালেহীন তৃতীয় খন্ড
২। পাক্ষিক আহমদী ১৯৯৮ইং
৩। পাক্ষিক আহমদী ১৯৯৯ইং

# রোযা ঃ তাকওয়ার চূড়ায় আরোহণ

হার ইক নেকী কি জড় ইয়ে ইত্তিকা হ্যা
আগার ইয়ে জড় রাহি তো সব কুছ রাহা
- (দুররে সামীন)

অর্থ ঃ প্রত্যেক নেকীর ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া যদি এ ভিত ঠিক থাকে সব যাবে পাওয়া।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাকওয়াকে প্রত্যেক নেকীর মূলস্বরূপ বলেছেন। তাই তাকওয়া বা খোদাভীতির পথে পদাচারণার ক্ষেত্রে নেকীগুলোকে শাণিত করার একটি পবিত্র মাস হচ্ছে রমযান। আর রমযানের আগমনে প্রতিটি মুসলিম হৃদয় উজ্জীবিত হয়।

আল্লাহ্তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন -

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং সরল সুদৃঢ় কথা বল ঃ (সূরাতুল আহযাব ঃ ৭১)।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে আমার আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে হেদায়াত তাকওয়া, পবিত্রতা ও অভাব-মুক্ততা চাই" (মুসলিম)।

আল্লাহ্র বাণী এবং তাঁর পবিত্র নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বাণী থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাকওয়াকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা আর তার মাধ্যমে খোদাপ্রাপ্তি মানব জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন-

এ পর্যায়ে অতিক্রমের পর দাস পুণ্যবান দাসে রূপান্তরিত হন, যেন তার সকল আনুষ্ঠানিকতার তখন অবসান ঘটে এবং স্বভাবতঃ ও প্রকৃতিগতভাবে তিনি পুণ্য অর্জনের সূচনা করলেন। এখন এক ধরনের শান্তির আলয়ে তিনি অবস্থান করছেন। সেখানে তার কোন ভয়-ভীতি নেই। প্রকৃতির তাড়না বিরোধী সকল সংগ্রামের অবসান ঘটেছে। তিনি এখন পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছেন। এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে আমাদের পূর্ণতম নেতা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেকের সাথে শয়তান রয়েছে কিন্তু আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে।"

আল্লাহ্তাআলা যুগে যুগে নবী রসূল ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের মাধ্যমে তাকওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি রেখেছেন (অর্থাৎ কলেমা, নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত) তার মাধ্যমে খোদাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয়ে যায়। যেহেতু পবিত্র রমযানের মাস চলছে তাই আজকের প্রবন্ধে রমযানের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করছি।

রমযান হচ্ছে ইসলামের তৃতীয় রোকন বা স্তম্ভ। চান্দ্র মাসের নবম মাসের নাম রমযান। পূর্বে রমযান মাসের নাম ছিল নাতেক (কাদীর)। রমযান শব্দটি "রময" মূল ধাতু থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ হচ্ছে পিপাসায় উত্তপ্ত হওয়া। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে রমস্ বলা হয়। যেহেতু রমযান মাসে রোযাদার পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ বিলাস হতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্র আদেশসমূহ পালন করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণের ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, সেজন্য এ আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রযমান হয়েছে। আভিধানিকগণ বলে থাকেন যে, রমযান গ্রীষ্মকালে এসেছিল বলে

একে 'রমযান' বলা হয়েছে। আমার মতে এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা, আরব দেশের জন্যে এতে কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও ধর্মে-কর্মে উদ্দীপনা। "রময" এমন উত্তাপ বলা হয় যদ্বারা পাথর প্রভৃতি পদার্থ উত্তপ্ত হয় (আল্-হাকাম, ২৪ জুলাই, ১৯০১ইং)।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "তৃতীয় বিষয়, যা ইসলামের মূল ভিত্তি, তা হল রোযা। রোযার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কেও মানুষ অনবহিত। প্রকৃত কথা এই যে, যে দেশে মানুষ যায় না এবং যে জগৎ সম্পর্কে সে অবহিত নয় সে ইহার অবস্থা কী বর্ণনা করবে? রোযা কেবল ইহাই নয় যে, মানুষ এ দিনে ক্ষুধা ও পিপাসার্ত থাকে। বরং ইহার তাৎপর্য ও ইহার একটি প্রভাব আছে, যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়। মানুষের প্রকৃতিতে ইহা আছে যে, সে যত কম খায় ততই তার আত্মা পবিত্র হয় এবং "কাশ্ফী" শক্তি (দিব্য-দর্শনের শক্তি) বৃদ্ধি লাভ করে। এতে খোদাতাআলার ইচ্ছা ইহাই যে, একটি খাদ্য কম কর এবং অন্যটিকে বাড়াও" (মলফূযাত, নবম খন্ড, পৃঃ ১২২-১২৩)।

"সর্বদা রোযাদারদের এ কথা দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, ক্ষুধার্ত থাকাই তার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উচিত সে খোদাতাআলার যিক্র এ মগ্ন থাকবে যাতে দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্মুখী হওয়া যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য ইহাই যে, মানুষ একটি রুটি ছেড়ে দিয়ে কেবল দেহ প্রতিপালন করে, দ্বিতীয় রুটি লাভ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ। যারা কেবল খোদার জন্য রোযা রাখে এবং নিছক রুসম হিসাবে রাখে না, তাদের উচিত আল্লাহ্তাআলার 'হামদ' (প্রশংসা), 'তসবীহ' (গুণকীর্তন করা) ও তাহ্লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠে মগ্ন থাকা, যদ্দরুন অন্য খাদ্যও তারা পেয়ে যাবে (মলফূযাত, নবম খন্ড, পৃঃ ১২৩)।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্পাক বলেন,

"রমযান সেই মাস যাতে কুরআন নাযেল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকানের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায় সে যেন এতে রোযা রাখে; কিন্তু যে রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করতে হবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না এবং তোমরা যেন গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন কর এ জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন (বল) নিশ্চয় আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর উত্তর দিই যখন সে আমার নিকটে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। (সূরাতুল বাকারা ঃ ১৮৬, ১৮৭)

এই আয়াতে রমযানের তত্ত্ব এবং মৌলিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। হযরত আকদস খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন- "উনযিলা ফিহিল কুরআন" - এত মহান মাস যে, কুরআন এ মাসের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। অনেক মুফাস্সির লিখেছেন যে, **"ওয়াস্তাইনু বিস্সবরে ওয়াস্ সালাত"** এর মধ্যে সবরের অর্থ হচ্ছে রোযা। এ রোযার মাসে কুরআনের সকল শিক্ষার উপর শক্তিশালী ও কার্যকরীভাবে আমল করা হয়ে থাকে।"

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- "রমযান ঢাল স্বরূপ"

ঢালের আড়ালে থেকে যেমন করে যুদ্ধ করা হয় তেমনি রমযানের আমলের আড়ালে মু'মিন পাপ হতে বাঁচে। তাই রমযানকে এমনভাবে প্রতিপালন করতে হবে যেন হৃদয়ের নেকীর ভ্রূণগুলো বৃদ্ধিপাপ্ত হয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। একইভাবে এক হাতে তলোয়ার থাকলেই তো অন্য হাতে ঢাল থাকে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালাম এজন্যই রোযাকে ঢালস্বরূপ বলেছেন, কেননা অন্য হাতের তলোয়ার দ্বারা পাপকেও কাটতে হবে। পাপ দূরীভূত হলে আর পাপের প্রাবল্য ঢালে আঘাত করতে করতে ক্লান্ত হলেই কিনা সে পরাজিত হবে অর্থাৎ পাপ বিদূরীত হবে।

সাধারণতঃ রোযা কী! কীভাবেই রাখতে হয়। সাধারণত প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির জন্য রমযান মাসে রোযা ফরয। সফরে থাকলেও রোযা পরে রেখে নিতে হয়। রোযা হচ্ছে শেষ রাতে উঠে সেহরী করে (সুবহে সাদেক পর্যন্ত সেহরী খাওয়ার সময় থাকে) পানাহার থেকে বিরত থেকে নামায, দোয়া ও পবিত্রতার মাধ্যমে দিন যাপন করে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা। মুসলমানদেরকে রমযান মাসের পুরোটাই রোযা পালন করতে হয়। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যেও উপবাসব্রত পালনের বিধান চালু ছিল। এখনও অনেক ধর্মের মধ্যে উপবাসব্রত পালনের রেওয়াজ আছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্পাক বলেন-

"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর (সূরাতুল বাকারা ঃ ১৮৪)।

**রোযা চার প্রকার ঃ**

১। ফরয রোযা - অর্থাৎ পবিত্র রমযানুল মোবারকের মাসে রোযা রাখা। পূর্বেই বলা হয়েছে অসুস্থ এবং মুসাফিরের জন্য রোযা পরে রাখার বিধান। অতিবৃদ্ধ, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী স্ত্রী লোকের জন্য রোযা নেই; তারা ফিদিয়া দিবে।

হাদীসে আছে- যদি কেউ ইচ্ছা করে একটি দিনও রোযা ছাড়ে তবে সে এমন গোনাহ্গার হয় যে, আজীবন রোযা থাকলেও পরিশোধ হবে না। ভুলে কেউ যদি এমন কিছু করে যাতে রোযা ভাঙ্গে অথচ সজ্ঞানে করে নি তাহলে রোযা নষ্ট হবে না। আবার যদি কেউ ভুলে সূর্য অস্তমিত হয়েছে মনে করে রোযা খুলে তাহলে আবার একদিন রোযা রাখতে হবে। যে ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা থাকবার পর জেনে শুনে রোযা ভঙ্গ করে অথচ সফরে নেই অথবা অসুস্থও নয় এ ধরনের লোকের কাফ্ফারা হল একজন গোলাম মুক্ত করা। আর তা করতে না পারলে ৬০ দিন রোযা রাখতে হবে আর তা না করলে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।

২। **নফল রোযা ঃ**

এ রোযাগুলো রাখলে সওয়াব আছে না রাখলে গুনাহ্ নেই। এ রোযার দিনগুলি হচ্ছে

(ক) শাওয়াল মাসের ৬ রোযা

(খ) প্রত্যেক চার মাসের মাসের ১৩, ১৪, ও ১৫ এ তিন দিন রোযা রাখা

(গ) যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ

(ঘ) মহররম মাসের ৯ ও ১০ তারিখে

(ঙ) একদিন রোযা রাখা ও একটি ভঙ্গ করা।

হাদীসে বর্ণনা এসেছে- "স্ত্রী যদি নফল রোযা রাখে তাহলে অবশ্যই স্বামীর অনুমতিক্রমে রাখতে হবে।"

৩। শুভাশভের জন্য দোয়া - যে রোযা মানুষ নিজে থেকেই কোন বিষয়ে মানত করে রেখে থাকে। কোন ব্যক্তির মানত রোযা ওয়ারিস রাখতে পারে।

৪। **কাফ্ফারাস্বরূপ রোযা ঃ**

কুরআন থেকে প্রমাণিত হয় যে,

(ক) কসম ভাঙ্গলে কাফ্ফারা স্বরূপ দশজন মিসকিনকে খাদ্য দিতে হবে। না পারলে একজন গোলাম মুক্ত হবে। তা-ও না পারলে তিনদিন রোযা রাখতে হবে।

(খ) রমযানের রোযা ইচ্ছাপূর্বক ভাঙ্গলে কোন মু'মিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে তার উপযুক্ত অর্থদন্ড দিতে না পারলে, স্ত্রীকে মা ডেকে তার কাফফারাস্বরূপ গোলাম মুক্ত করতে না পারলে, যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরাহ্ পালন করার পর

কুরবানী করতে অসমর্থ হয় তবে সে তিনদিন মক্কায় রোযা রাখবে এবং বাড়ীতে ফিরে সাতদিন রোযা রাখবে। কষ্ট বা অসুস্থতাবশত ইহরামের অবস্থায় মাথার চুল মুন্ডন করলে তিনদিন রোযা রাখতে হবে।

রমযানের দিনগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ছে। প্রথম দশক রহমতের, দ্বিতীয় দশক মাগফিরাতের এবং শেষ দশক নাজাতের। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করবে"। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না যায় তাহলে রমযানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। হাদীসে রমযানের মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা এসেছে।

(১) সেহরী খাবে কারণ সেহরী খাওয়াতে বরকত আছে।

(২) তোমরা যখন সেহরী খাও তখন খাওয়া শেষ হবার পূর্বেই যদি আযান হয়ে যায় তবে আযান আরম্ভের সাথে সাথেই খাবার পরিত্যাগ করবে না বরং খাওয়া শেষ কর।

(৩) উম্মত ততদিন পর্যন্ত উন্নতির পথে থাকবে যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতারী করবে (অর্থাৎ সূর্যাস্ত যাওয়ার সাথে সাথে)।

(৪) আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একবার যাত্রাপথে একস্থানে মানুষের ভীড়ের মধ্যে দেখলেন, এক ব্যক্তির মাথার উপর ছায়া করে রাখা হয়েছে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বললেন, কী হয়েছে? বলা হল, এ ব্যক্তি রোযাদার। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বললেন-সফরে রোযা রাখার মধ্যে কোন পুণ্য নেই।

(৫) রোযা অবস্থায় দাঁত মাজা, ব্রাশ করা, বা দাঁতন দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা রোযাদারদের জন্য সুন্নত।

(৬) তেল এবং সুগন্ধ বা আতর ব্যবহার করাও উত্তম।

(৭) (হাদীসে আছে)- আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তানের সকল কাজ তাঁর নিজের জন্য, কিন্তু রোযা আমার জন্য। আর আমি নিজেই এর পুরস্কার।

(৮) তোমাদের মধ্যে যে রোযাদার সে বৃথা ও অহেতুক কথা বলবে না। শোরগোল করবে না। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সঙ্গে ঝগড়া কলহে প্রবৃত্ত হয় তবে সে প্রত্যুত্তরে বলবে, "আমি রোযা রেখেছি"।

(৯) যে ব্যক্তি ফযরের নামাযের পূর্বে রোযার নিয়্যত করে না তার জন্যে কোন রোযা নেই।

(১০) হে মুসলমানগণ! সেহরী খাও। কেননা, সেহরী খাওয়ার মধ্যে কল্যাণ আছে।

(১১) যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতারি করায় সেও অনুরূপ পুণ্য লাভ করে অথচ রোযাদারের পুণ্য কোন অংশে কমে যায় না।

(১২) জান্নাতের একটি দরজার নাম "রাইয়্যান"। পরকালে ঐ দরজা দিয়ে কেবলমাত্র ঐ সকল মু'মিনগণই প্রবেশ করতে পারবে, যারা (দুনিয়াতে) রোযায় অভ্যস্ত ও অনুরাগী ছিল। অন্য কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। রোযাদারগণকে বিশেষভাবে আহবান করা হবে এবং তারা অগ্রসর হবে। অন্য কেউ অগ্রসর হতে পারবে না। রোযাদারগণের প্রবেশান্তে উহা বন্ধ করে দেয়া হবে। অন্যদের উহাতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

রমযান মাসে রসূলুল্লাহ্ এমনভাবে ইবাদত করতেন সেভাবে অন্য সময় করতেন না। তাঁর সাধারণ দিনগুলোতে ইবাদতে অনেক উচ্চাঙ্গীন ছিল। আর রমযানে ইবাদতের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিতেন।

রোযার শেষ দশকে ই'তিকাফ করা হয়। কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে- "ওয়া আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদে" - অর্থাৎ যখন তোমরা মসজিদ সমূহে ই'তিকাফে থাক"। ই'তিকাফের রাতগুলোতে (বেজোড় রাতগুলোতে) লায়লাতুল কদর বা সৌভাগ্যের রাত্রি এসে থাকে। পবিত্র কুরআনে সূরাতুল কাদরে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন-

"নিশ্চয়ই আমরা একে (কুরআন শরীফকে) কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। তোমরা কি জান যে, কদর এর রাত কী? কদর-এর রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। (হাজার মাস অর্থ সারা জীবন। হাজার মাস উপমাস্বরূপ বলা হয়েছে।) এ রাতে অসংখ্য ফিরিশ্তা অবতরণ করেন এবং রূহুল কুদুস, নিজ প্রভুর আদেশে প্রত্যেক বিষয়ে ফিরিশ্তাসহ অবতরণ করেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে সালাম বা শান্তির এ ধারা ফজরের পূর্ব পর্যন্ত প্রবাহমান থাকে।"

এ বরকতময় মাসে ইবাদতের জন্য বিশেষভাবে তাহরীক করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণনা এসেছে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'গুনাহে কবীরা - বা বড় বড় পাপ থেকে নিজকে রক্ষা করা, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআর নামায পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত, এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হতে পারে। এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, শুধু মাত্র রমযানের শেষ দশক ইবাদত করার মধ্যে কোনই মাহাত্ম্য নেই যদি না সারা বৎসর গুনাহ্ থেকে মুক্ত থেকে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমুআর নামায এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান পর্যন্ত ইবাদত ও তাহমীদ তাহলীলে ব্যস্ত থাকে। আর এসব পালন করলে সারা জীবনই একজনের জন্য লায়লাতুল কদর। দান খয়রাতের বিষয়ে আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন- "সাধারণত সারা বছরই আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দান খয়রাত করতেন। কিন্তু রমযান মাসে যেমন প্রবল বেগে ঝড় বয়ে যায় তেমন করে দান খয়রাত করতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আরো বলেন-

"শেষ দশকে প্রবেশের সময় আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কোমর বেঁধে ইবাদতে নামতেন, রাতগুলোকে উজ্জীবিত করতেন। গৃহবাসীদের সকলকে শেষ রাতে জাগিয়ে দিতেন। আমি একবার আঁ হযরতের খেদমতে জানতে চেয়েছিলাম, "যদি আমি বুঝতে পারি যে, আজ লায়লাতুল কদর, তখন আমি কী দোয়া করব"। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন- বল,

"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউবুন, তুহিব্বুল আফওয়া, ফা'ফুআন্নী।" (হে আল্লাহ্! নিশ্চয় তুমি মূর্তিমান ক্ষমা। তুমি ক্ষমা করাকে পসন্দ কর, অতএব আমাকে ক্ষমা কর)।

লায়লাতুল কদর নিয়ে কোন নিশ্চিৎ দিন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও বলে যান নি। তাই শেষ দশদিন ইবাদতে মশগুল থেকে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা বা নফসে মুতমাইন্নাহ্তে উন্নীত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে দোয়ায় রত থাকতে হবে।

রমযানে বিশেষভাবে তাহাজ্জুদের উপর জোর দিতে হবে। হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় থেকে তারাবীহ্র ব্যবস্থা করা হয়। তারাবীহ্ এশার পর আট রাকাত (দুই রা'কাত করে) পড়তে হয়।

তারাবীহতে সমস্ত পবিত্র কুরআন পড়ার নিয়ম রয়েছে। এছাড়া সূরা তারাবীহ্ও পড়া যায়। সে উন্নত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার জন্য এ সাধনা এবং তাকওয়ার পথ পরিক্রমার যে প্রচেষ্টা, সেই উন্নীত হওয়ার অবস্থার বর্ণনা খোদার ভাষায় করে এ প্রবন্ধ শেষ করছি ঃ

♦"হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা!

♦তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট, তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট

♦সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর।

♦এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে (সূরাতুল ফজর ঃ ২৮-৩১)"।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

**- মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব (জয়)**

# ওসীয়ত সংক্রান্ত নিয়মাবলী

ওসীয়্যত করতে ইচ্ছুক ভ্রাতা ও ভগ্নীগণকে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাবলী পালন করার অনুরোধ জ্ঞাপন করছি ঃ

(১) ওসীয়্যত ফরম পূরণ করার পূর্বে কেতাব "আল্ ওসীয়্যত" ও এর পরিশিষ্ট ও রুলিংসমূহ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ অথবা শ্রবণ করতে এবং দোয়া করতে হবে। তাঁকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে, ওসীয়্যত (উইল) গৃহীত হবার প্রথম ও পূর্বশর্ত হচ্ছে উইলকারীকে অবশ্যই একজন ধার্মিক, পরহেযগার হতে হবে এবং তাঁকে অবশ্যই শরীয়তের বিধি-নিষেধ মান্যকারী, ধর্মকে পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দানকারী, সত্যবাদী, অকপট, পরিষ্কার ও আন্তরিক আহমদী মুসলমান হতে হবে।

(২) স্বাস্থ্যবান অবস্থায় ওসীয়্যত করতে হবে। এমন অসুস্থাবস্থা, যার পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু, সে অবস্থায় সম্পাদিত ওসীয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৩) ওসীয়্যত ফরমে লিখিত কোন বিষয় দ্ব্যর্থবোধক অথবা অস্পষ্ট হওয়া চলবে না এবং লিখা পরিষ্কার, একই কলমের হতে হবে, সাক্ষীগণ দ্বারা সত্যায়িত হতে হবে এবং সাক্ষীগণের পূর্ণ ঠিকানা থাকতে হবে।

(৪) স্থাবর সম্পত্তির তালিকায় উইলকারী ও তাঁর উত্তরাধিকারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে। এছাড়াও সম্পত্তি যে স্থানে অবস্থিত উহার বিবরণ যেমন- গ্রাম, পোস্ট অফিস, থানা ও জেলার নাম উল্লেখ করতে হবে।

(৫) স্ত্রীলোকের উইলে সাক্ষী হিসাবে যদি তার স্বামী জীবিত থেকে থাকেন তাহলে তার স্বাক্ষর থাকতে হবে। মোহরানা স্ত্রীলোকের সম্পত্তির অংশ বটে। এর পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। স্বামীর নিকট থেকে এটা আদায় হয়েছে কি-না তা-ও উল্লেখ করতে হবে। গহণাপত্রের তালিকায় প্রত্যেকটির ওজন ও মূল্য উল্লেখ করতে হবে।

(৬) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং অর্জিত সম্পত্তি আলাদাভাবে দেখাতে হবে।

(৭) সম্পত্তি ছাড়াও প্রত্যেক উইলকারী তাঁর মাসিক আয়ের অংশ উইলের মাধ্যমে দান করবে। আয় কমলে অথবা বাড়লে সে বিষয়ে সাথে সাথে স্থানীয় ও জাতীয় জামাতের মাধ্যমে মজলিস কারপারদাযকে অবহিত করবে।

(৮) উইলের মাধ্যমে দানকৃত আয়ের অংশ যে মাস থেকে উইল কার্যকর, সে মাস থেকেই পরিশোধ করতে হবে।

(৯) ৬ মাসের অধিক কাল দানকৃত আয়ের অংশ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অথবা সে বিষয়ে অপারগতা জানিয়ে পরিশোধের সময়কাল বর্ধিত করে না নিলে অথবা খোদা না করুন, আহমদীয়ত অস্বীকার করলে উইল বাতিল হবে।

(১০) সর্বোচ্চ $^{১}/_{৩}$ এবং সর্বনিম্ন $^{১}/_{১০}$ অংশ ওসীয়্যত করা যাবে।

(১১) উইল (ওসীয়্যত)কারী এবং সাক্ষীগণ উভয়েই তাদের সাথে পাশাপাশি বৃদ্ধাঙ্গুলীর ছাপ দেবেন। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে তাদের ডান হাতের এবং পুরুষের ক্ষেত্রে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর ছাপ দিতে হবে।

(১২) "আল্ ওসীয়্যত" কেতাবের পৃষ্ঠা ১২৪-১২৭-এ চার ধরনের খসড়া রয়েছে। প্রযোজ্য খসড়াটি ওসীয়্যত ফরমের ১ম পৃষ্ঠার খালি জায়গায়, সম্ভব হলে স্বহস্তে, লিখে ফরম পূরণ করুন।

(১৩) "শর্তে আওয়াল" ও "এলানে ওসীয়্যত" খাতে ন্যূনতম দুই শ' করে টাকা প্রদান করে উহার রসিদ (মূলকপি) ওসীয়্যত ফরমের সাথে গেঁথে প্রেরণ করুন।

(১৪) ওসীয়্যতের আবেদন পত্রের সাথে ওসীয়্যতকারীর বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের আর্থিক কুরবানীর হিসাব সম্বলিত সিডিউল(তফশীল)'ই' প্রেরণ করতে হবে।

**- মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ওসীয়্যত

## কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আমার ছোট মেয়ে খালিদা এদিব চৌধুরী, যশোর এম, এম কলেজ থেকে বি.এস.সি অনার্স এ প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছে। আমার এই মেয়েটি ধর্ম-ভীরু কষ্ট-সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। তার জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

**- সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী**

## ৭ম বার্ষিক ইজতেমা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঘাটুরার ৭ম বার্ষিক ইজতেমা গত ১২ই অক্টোবর রোজ শনিবার পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে উদযাপন করা হয়।

**- আমাতুল হাই সালমা, ঘাটুরা**

## হেলেঞ্চাকুড়িতে মজলিস আনসারুল্লাহ্র আঞ্চলিক তা'লীমূল কুরআন ক্লাস, কর্মশালা ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে গত ৪ অক্টোবর থেকে ১১ই অক্টোবর, ০২ইং পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী আঞ্চলিক তা'লীমূল কুরআন ক্লাস ২দিনব্যাপী কর্মশালা ও ইজতেমা মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুরের মজলিসসমূহ নিয়ে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে হেলেঞ্চাকুড়ি মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

**- কে এম মাহবুবউল ইসলাম**
চেয়ারম্যান, তা'লীমুল কুরআন ক্লাস কমিটি

## ১০ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৩/১০/২০০২ইং আহমদীয়া মুসলিম জামাত নারায়ণগঞ্জ এ লাজনা ইমাইল্লাহ্র ১০ম বার্ষিক ইজতেমা, ২০০২ইং অনুষ্ঠিত হয়েছে, আল্হামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমাতে লাজনার সদর সাহেবা মোহতারমা মাকসুদা রহমান উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হোসনে আরা আজিজ ও রোকেয়া আহমদ লাজনা ও নাসেরাতদের লিখিত পরীক্ষা কুরআন তেলাওয়াত নযম বিভিন্ন বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষাসহ খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় যারা বিজয়ী হয়েছেন তাদেরকে পুরস্কার বিতরণ এবং ইজতেমার শেষে একটি আকর্ষণীয় হস্তশিল্প প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। উক্ত ইজতেমাতে উপস্থিত ছিলেন ১০১ জন লাজনা সহ ৪৭ জন নাসেরাত।

**- কাউসার আপা**
জেনারেল সেক্রেটারী
লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ

## সন্তান লাভ

মহান আল্লাহ্‌তাআলা বিগত ১৬/১০/২০০২ইং তারিখ রোজ বুধবার দিবাগত রাত ১১-০০ টায় আমাকে ও মিসেস মুনীরা বেগম ছবিকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন, আল্ - হামদুলিল্লাহ্। নবজাত শিশু কন্যার জন্মের পূর্বেই হুযূর (আইঃ) তাকে 'ওয়াকফে নও' এ মঞ্জুর করেছেন। নবজাতিকা শাহ মোহাঃ আবদুল গনি সাহেবের দৌহিত্রী। নবজাতিকা ও তার মায়ের সু-স্বাস্থ্য সহ দীর্ঘায়ুর জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট সবিনয়ে দোয়ার আবেদন করছি।

**- মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক**
মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ

## শোক সংবাদ

আমার আব্বা জনাব আলী আকবর মাষ্টার সাহেব গত ৩-১১-২০০২ইং রাতে আনুমানিক ১১.৩০ টার দিকে বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)। তিনি ৯৮ এর শেষ দিকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এ বয়াত গ্রহণ করেন। আমার আব্বার রূহের মাগফেরাত এবং তাঁর পরিবারের সকলের সাবরে জামীলের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। উল্লেখ্য, নব্বই বৎসর বয়সের সময় আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা স্বেচ্ছায় পূর্ণভাবে বুঝে বয়াত করেন।

**- মোঃ সাহেব উদ্দীন, ঢাকা**

## তা'লীমুল কুরআন ক্লাস, ইজতেমা ও কর্মশালা ২০০২

১১ অক্টোবর শুক্রবার বাদ আসর ক্লাসের শুভ উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। বরিশাল রিজিয়নের ৫টি মজলিস ও স্বাগতিক খাকদান মজলিসের হালকা কৃষ্ণনগর ও পার্শ্ববর্তী তবলিগী স্পট আওলিয়াপুর বাউরিয়া হতে উল্লেখযোগ্য নও মোবাঈন ক্লাসে অংশ গ্রহণ করেন। দিনের বিভিন্ন সময়ের নির্ধারিত ক্লাসে অংশ গ্রহণ করেন ৫০ জন ছাত্র। এর মধ্যে আনসারুল্লাহ্ ৩০ জন।

**- শাহ্ আলম খান,** মোয়াল্লেম

## শুভ বিবাহ

❑ মরহুম মোঃ ফজলুল হক-এর কন্যা মোসাম্মাৎ ফারজানা হক, সাং- ৪৩, ফয়েজ লেক, খুলশী, চট্টগ্রাম -এর সাথে জনাব এম, এ, হাকিম সরদার-এর পুত্র জনাব এস, এম, মঈন আল হোসাইনী, সাং- ওসমান মঞ্জিল, ৩৯১-এ, মদীনা মসজিদ লেন, পশ্চিম বাকালিয়া, চট্টগ্রাম-এর বিয়ে ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৫/০৪/০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম বায়তুল বাসেত মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, মুরব্বী সিলসিলাহ্। কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং- ০৩০৫/০২ তারিখ ২৩/১০/০২।

❑ জনাব আব্দুস সালাম-এর কন্যা মোসাম্মাৎ আমেনা খাতুন, সাং- কটিয়াদী, জেলা- কিশোরগঞ্জ-এর সাথে জনাব মসিউর রহমান-এর পুত্র জনাব কায়েস আহমদ (মানিক) সাং- দক্ষিণ ভাদুঘর, জেলা- বি.বাড়ীয়া-এর বিয়ে ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২১/০৬/০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদী জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ আবুল কাসেম আনসারী, মোয়াল্লেম। কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং- ০৩০৭/০২ তারিখ ২৪/১০/০২।

❑জনাব শেখ মিজানুর রহমান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ নূসরাত জাহান (টগর), সাং- যতীন্দ্রনগর, থানা- শ্যামনগর, জেলা- সাতক্ষীরা-এর সাথে জনাব নিয়াজ মুহাম্মদ খান-এর পুত্র জনাব মাহমুদুর রহমান খান,সাং- উত্তর আহমদী পাড়া, জেলা- বি.বাড়ীয়া-এর বিয়ে ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০২/০৭/০২ তারিখ, রোজ মঙ্গলবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং- ০৩০৮/০২ তারিখ ২৪/১০/০২।

❑ মরহুম মসীহ্ উল ইসলামের কন্যা মোসাম্মাৎ রুমানা তাবাস্‌সুম (রুমানা) ১/ই, ২/৪, মীরপুর ঢাকা-এর বিয়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াস্থ সরাইলের মীর পরিবারের মরহুম মীর মাহবুব আলী সাহেবের এক মাত্র পুত্র এবং সাবেক ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের দৌহীত্র জনাব মীর মাহবুব মোস্তফা আলী'র সাথে ২,৫০,০০১/= (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৫/০৯/০২ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর কর্তৃক এ বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩০২/০২, তারিখ ২৩/১০/০২।

❑ জনাব মরহুম মোঃ ফজলুল হক-এর কন্যা মোসাম্মাৎ আমেনা খাতুন, সাং- কটিয়াদী, জেলা- কিশোরগঞ্জ-এর সাথে জনাব মসিউর রহমান-এর পুত্র জনাব কায়েস আহমদ (মানিক) সাং- দক্ষিণ ভাদুঘর, জেলা- বি.বাড়ীয়া-এর বিয়ে ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২১/০৬/০২ তারিখ, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদী জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ আবুল কাসেম আনসারী, মোয়াল্লেম। কেন্দ্রীয় রিশ্‌তানাতা দপ্তর কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সু-সম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং- ০৩০৭/০২ তারিখ ২৪/১০/০২।

এসব বিয়ে সকল দিক থেকে বরকতমন্ডিত হওয়ার জন্যে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

**- মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার**
ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

**TRUST THE LOGO**

**CALL CONCORD**

CONCORD

# CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220,.8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP

Tax Consultant

## Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

**Business Solution :**

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

**Address :**

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

## ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

## সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

## সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৮৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

**PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.**

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 65 ◆9th Issue

November 15, 2002 ◆Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ

# Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

**ASIASAT 2**

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

**DISH POSITION 100.5° EAST**

| | | |
|---|---|---|
| **FREQ.** | - | **3660** — 3760 |
| **S.R** | - | **27500** |
| **POL** | - | **VERTICAL** — Hor |

symbol - 2600
FEC - 7/8

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

## আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com